



বাণী

পলাশের রঙ









বাগিয়ান

Batayan

পঞ্চদশ সংখ্যা, মার্চ ২০১৯

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়





Issue Number 15 : March, 2019

### Editors

Ranjita Chattopadhyay, IL, USA  
Jill Charles, IL, USA (English Section)

### Coordinator

Manas Ghosh, Kolkata, India  
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

### Networking & Communication

Biswajit Matilal, Kolkata, India

### Design & Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata, India

### Website Support

Susanta Nandi, India

### Published By

**BATAYAN INCORPORATED**

Western Australia

Registered No. : A1022301D

E-mail: [info@batayan.org](mailto:info@batayan.org)

[www.batayan.org](http://www.batayan.org)

### Production & Management

Anusri Banerjee

### PHOTO CREDIT

Kaushik Mazumder  
Kolkata, India

Front Cover &  
Title Page

Amit Dalal and Kaushik Mazumder are thankfully acknowledged for their photography, used in this issue.

Pulak Bandyopadhyay  
Michigan, USA

Back Cover



Pulak Bandyopadhyay an engineer by profession enjoys his time clicking some special moments.

Tirthankar Banerjee  
Perth, Australia

Front & Back Inside Cover



His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

---

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

---

## সুজয় দত্ত

### ফিরে দেখা

প্রিয় সম্পাদিকা,

‘বাতায়নের’ এক নিয়মিত পাঠক ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বিগত কয়েক বছরে এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা সম্বন্ধে আমার মতামত সাক্ষাতে, দূরভাষের আলাপচারিতায় বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে আপনাকে বহুবার জানিয়েছি। এবার ঠিক করলাম কলম ধরব। প্রথমেই বলি, ২০১৮-র শেষ নাগাদ যখন আপনার কাছে শুনলাম নতুন বছরের প্রথম সংখ্যার বিষয়বস্তু হতে যাচ্ছে ‘ফিরে দেখা’, গোড়ায় একটু ধসে ছিলাম – তার মানে কি সদ্য পাঁচে পা দেওয়া ‘বাতায়ন’ তার চার বছরের অতীতকে দর্পণে দেখতে চাইছে? মনে পড়ে গেল, আমার এক বন্ধুর পাঁচ বছরের মেয়ে তার স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ‘বুক প্রজেক্টে’ (অর্থাৎ রংপেন্সিল আর ক্রেয়নে আঁকা ছবির পাতাগুলোকে স্টেপল করে বই বানানোর প্রকল্পে) বিষয় রেখেছিল ‘মাই লাইফ স্টোরি’ আর তাই দেখে তার কলকাতা থেকে সদ্য আসা দাদু সর্কৌতুকে “তোমার বয়স কত দিদিভাই – আশি না নব্বই?” বলায় সে মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করেছিল “Mummy, granpa is being mean”। তো, আমিও আমার কলমে ওরকম ‘mean’ হব কি না ভাবছি, এমনসময় খবর এল ‘বাতায়নের’ জানুয়ারী ২০১৯ সংখ্যাটি বেরিয়ে গেছে। ওয়েবসাইটে গিয়ে পাতা উল্টে দেখি যা সন্দেহ করেছিলাম আদৌ তা নয় – ‘বাতায়ন’ মোটেই কোনো অতিগর্বিত আত্মপ্রেমীর মতো বলতে চাইছে না “আরশি, আরশি, দেখ তো আমার অতীতটা কেমন সুন্দর!” (যদিও অতীতটা যে সুন্দর সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই)। তার ফিরে দেখার বিষয় ফেলে-আসা বছরটা, আর সেই বছরের বারোমাস্যার মধ্যে নিহিত পাওয়া-হারানো, দুঃখ-আনন্দ আর আশা-হতাশার রঙীন সুতোয় বোনা বর্ণময় নকশি কাঁথাটি – যা অনাদি-অনন্ত কালপ্রবাহের মধ্যে এক তুচ্ছতিতুচ্ছ স্থানবিন্দু হয়েও স্বমহিমায় স্বতন্ত্র। সেই বহুবর্ণময় ছবিটিকে বছরের শেষপ্রান্তে এসে হঠাৎ কেন স্মান, নিশ্চল লাগছিল – সেই বেদনা আপনার সম্পাদকীয়তে যথাযথভাবে ফুটেছে। বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ‘পল্লবিত পুষ্পকাননে’ একের পর এক ঝরে যাওয়া উজ্জ্বল, সুগন্ধী ফুলগুলিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ‘বাতায়ন’ শুরু করেছে তার পুরনো বছরের স্মৃতিচারণ।

২০১৮-র হিসেবের খাতায় পাওয়ার ঘরে প্রথমেই রয়েছে গত ৬ই জানুয়ারী কলকাতায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক বাড়ীতে আয়োজিত এক মিলনোৎসব। যার সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ বিবরণ আমরা পাই অনুষ্ঠানের সংগলক শ্রী স্নেহাশিস ভট্টাচার্যের কলমে। ‘বাতায়নকে’ যাঁরা জন্মলাগ্ন থেকে একটু একটু করে বেড়ে উঠতে দেখেছেন, সব ঝড়ঝাপটা আর প্রতিকূলতা থেকে তাকে পরম স্নেহমমতায় আগলে রেখেছেন আর আপন সৃষ্টিশীলতায় তাকে পুষ্টি জুগিয়েছেন – তাঁরা তার পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে একত্রিত হয়েছিলেন এক উপভোগ্য সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়। কবিতায়-গল্পে-আড্ডায়-হাস্যরসে সে এক অনাবিল অভিজ্ঞতা। আমরা যারা সেখানে সেদিন উপস্থিত থাকতে পারিনি – স্নেহাশিসবাবুর লেখার গুণে তার আঁচ দূরে বসেও অনুভব করতে পারছি।

‘বাতায়নের’ এই সংখ্যার কবিতার ডালি দেখে কলকাতার এক অতি-জনপ্রিয় বাংলা ব্যান্ডের বহুশ্রুত একটি গানকে সামান্য বদলে বলতে ইচ্ছে করে, “এভাবেও ফিরে দেখা যায়!” কারণ দশজন কবির লেখায় ‘ফিরে দেখা’-র মূলসুরটি বেজেছে ভিন্ন ভিন্ন মূর্চ্ছণায়। অংশুমান করের কবিতায় মায়ের স্মৃতি ফিরে আসে নারীশক্তির উপলব্ধি হয়ে। গৌতম দত্তের লেখায় পাই অতীতের পুনরাবৃত্ত ভুলের অসহায় স্বীকারোক্তি এবং তা-থেকে উৎসারিত অবরুদ্ধ আক্ষেপ ও নিঃশব্দ যন্ত্রণা। শ্রীজাতা গুপ্ত স্মৃতিমেশানো ইচ্ছের রঙে একজন ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকরের মতো ছবি ঝঁকেছেন তাঁর মানসপ্রেমের। দেবশীষ ব্যানার্জীর লেখায় রূপক ও চিত্রকল্পের অনবদ্য প্রয়োগে ফুটে ওঠে ইচ্ছে-ঘুড়ির হাত ধরে আত্মসন্ধানের বেরোনোর পূর্ববর্তী জীবন আর সেই জীবনের অপূর্ণ সাধগুলির জন্য করুণ স্মৃতিকাতরতা। রবিরশ্মি ঘোষ তাঁর মহাকাব্যিক রচনালীতে

পাঠকে যেন ‘টাইম মেশিনে’ চাপিয়ে সোজা নিয়ে গিয়ে ফেলেন সেই পৌরাণিক যুগে। স্নেহাশিস ভট্টাচার্যের কবিতায় ভালবাসার উষ্ণ-নরম অনুভূতি-জড়ানো আর হৃদয়রাঙানো কোন্ এক হারিয়ে যাওয়া গোখুলি-বিকেলকে ফিরে পাওয়ার আকুতি। উদ্দালক ভরদ্বাজের লেখায় প্রিয়-হারানোর স্মৃতি যেন এক সর্বগ্রাসী শূন্যতার কাল্লাভেজা হাহাকার হয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। অতীশ ব্যানার্জীর কবিতাটি পড়ে কেন জানিনা আমার মনে হচ্ছে ওর মধ্যে দুটি আলাদা আলাদা কবিতা মিশে গেছে, যার প্রথমটি (নাম ‘অর্থহীনস্মন্যতা’) স্মৃতির তুলির টানে আঁকা টুকরো টুকরো ছবিতে এক গভীরতর অর্থ পেয়েছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় কবিতাটির (শেষ তিনটি অনুচ্ছেদ) নাম কী এবং ফিরে দেখার বিষয়ে তার প্রাসঙ্গিকতা কী – সে-প্রশ্ন রয়েছে। আনন্দ সেনের সাবলীল ছন্দে লেখা উপভোগ্য কবিতাদুটি যেন একটিই কথোপকথন – প্রশ্ন আর উত্তর। প্রথমটি স্মৃতি হাতড়ে হারানো প্রেমের খুঁটিনাটি জানতে চায়, স্বীকারোক্তি খোঁজে। দ্বিতীয়টি সেই স্বীকারোক্তি দিতে গিয়ে থমকে যায়, প্রসঙ্গ পাল্টায়, শেষে অনেক না-বলা কথা বাকী রয়ে যায়। আর মানস ঘোষের অণুকবিতা-তিনটি ‘ফিরে দেখা’ থিমের বাইরে হলেও এই সংখ্যার কবিতা বিভাগে তিনটি উজ্জ্বল সংযোজন।

কবি তন্ময় চক্রবর্তীর কলমে অগ্রজ কবি প্রয়াত নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্মৃতিরোমস্থল যেন কবিতা হয়ে উঠেছে। মাত্র দুপৃষ্ঠার পরিসরে নীরেন্দ্রনাথের মতো কাব্য-ব্যক্তিত্বকে তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তা এককথায় অনবদ্য। মনে হয়, এরকম একটি লেখা পেলে আর পাতার পর পাতা-জোড়া নীরস প্রবন্ধের দরকার কী?

প্রিয় সম্পাদিকা, আপনি হয়তো ছবি আঁকেন না, কিন্তু আপনার তো দেখছি শিল্পীর চোখ, মন, অনুভূতি – সবই রয়েছে। পত্রিকা সম্পাদনার প্রয়োজনে আপনাকে হয়তো তথ্যনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ লেখা লিখতে হয় বেশ কিছু, কিন্তু আমার সবসময়ই মনে হয়েছে আপনি অনুভূতিনির্ভর আর ভাবপ্রধান লেখায় বেশী স্বচ্ছন্দ। ভুল বললাম কি? আসলে আপনার লেখাটা পড়া-ইস্কাক আমার চোখে ভাসছে ছবি আর কানে ভাসছে গান। এমন ফিরে দেখা তো নিছক স্মৃতিকন্ডুয়ন নয়, যেন মনক্যামেরার ‘এস্ ডি কার্ড’ দেখা।

শাশ্বতী নন্দীর গল্পটা কিন্তু শুধু শাশ্বতী নন্দীর নয়। আমারও। হয়তো আপনারও এবং আরো অনেকের। আমাদের অনেকের জীবনেই তো সময় নামক নদীপ্রবাহের বাঁকে-বাঁকে ছড়িয়ে থাকা স্মৃতি-বিনুকের খালের ভেতর ঐরকম কত মণিমুক্তো লুকিয়ে আছে – শুধু কুড়োবার সময়টা নেই। তাই বলছি, ‘বাতায়নের’ এই ‘ফিরে দেখা’ সংখ্যাটা বড় জরুরী ছিল। আর দেবীপ্রিয়া রায়ের গল্পের (থুড়ি, জীবনকাহিনীর) সঙ্গেও গত শতাব্দীর পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে ভারতের রক্ষণশীল সমাজে জন্মে এবং বড় হয়ে পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষা বা বিবাহসূত্রে এদেশে পাড়ি জমানো অনেক বঙ্গললনাই মিল খুঁজে পাবেন। স্মৃতির এটাই মজা – অনেকসময় আমার-আপনার জীবন একই খাতে না বইলেও হয়তো দেখা যায় দুজনের স্মৃতিপথ গিয়ে মিশেছে একই উৎসমুখে। এভাবেও মানুষ পরস্পরের কাছে আসতে পারে। আর পরিশিষ্টে উনি আধুনিক বিশ্বে বলিউডের ভাবমূর্তির বিবর্তন ও তার ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে ওঠা নিয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন, আমাদেরও (অর্থাৎ ওঁর চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ এবং বেশ কিছু বছর পরে এদেশে আসা অভিবাসীদেরও) অনেকের অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

মনীষা বসু তাঁর লেখায় বিষুপ্ৰিয়াদি নামক যে চরিত্রটিকে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন, তাকে আমরা (যারা দু-প্রজন্ম আগের বঙ্গসমাজে বেড়ে উঠেছি) আমাদের ছোটবেলাকার সমাজে আর সমসাময়িক সাহিত্যে/চলচ্চিত্রে ভালই চিনতে পারি। চরিত্রটি আমাদের সেইসব স্মৃতি উস্কে দেওয়ায় যথেষ্ট কার্যকরী। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এমন এক সময়ে আর সামাজিক প্রেক্ষাপটে জন্মেছে যে তাদের ক্ষমতা নেই আমাদের এইধরনের স্মৃতির অংশীদার হওয়ার বা তাকে বুঝতে পারার। শুধু নিজেদের মধ্যে স্মৃতিবিনিময়ের সময়েই আমরা পরস্পরকে এইধরনের গল্প শোনাতে পারি।

পিনাকী মন্ডলের গল্পটি অবশ্য তাঁর স্মৃতিরোমস্থল বা স্মৃতিকাতরতা নিয়ে নয়। এটি স্মৃতি-বিষয়ক একটি রহস্যময় গল্প – কিছুটা আলৌকিকও বলা চলে। লেখক তাঁর রচনশৈলীর গুণে আগাগোড়া একটা ‘কী হয় কী হয়’ ভাব ধরে রাখতে পেরেছেন, তাই গল্পটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

## উদালক ভরদ্বাজ

বাতায়নের প্রত্যেক পাতায় শুধু উৎকর্ষতা নয়, উষ্ণতাও। এই কাজের পিছনের মানুষগুলোর অপরিসীম মমতা আর যত্নের ছোঁয়া খুব সহজেই স্পর্শ করে পাঠকের মন। সৌকর্য ও বিন্যাসের নান্দনিকতায় তো মুগ্ধ হতেই হয়। কিন্তু ছিমছাম no-nonsense সাজের মোড়ক পেরিয়ে যখন লেখায় মনঃসংযোগ করা যায়, তখন আমরা বুঝি, এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রত্যেকটি লেখার গুণগত মানকে এক বিশেষ উচ্চ পর্যায়ে ধরে রাখার ব্যাপারে আপোষহীন। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বাতায়নে প্রকাশিত প্রত্যেকটি লেখা অত্যন্ত উঁচু মানের। পৃথিবীর অজস্র শহরের নানা জীবিকার মানুষ লিখছেন বাতায়নে। ওহায়োর পরিসংখ্যানবিদ থেকে কাশীর ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক, এডিনবরার মনস্তত্ত্ববিদ থেকে ভারতীয় রেলের ট্রেনচালক, সবাই লিখছেন খোলা মনে, খোলা জানালার ম্যাজিক জার্নালে। কবিতা, গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, অনুবাদ এবং যা-খুশি। অথচ এই আপাত খামখেয়ালিপনা প্রকাশের বাড়তি আনন্দটুকু পাঠক পাচ্ছেন, বিশৃঙ্খলতাটুকু বাদ দিয়ে। আবেগ, প্রয়াস ও নিখুঁত প্রকাশ-শৈলীর সম্মেলনে সৃষ্টি হয়েছে এই অনবদ্য আয়োজন। আমার বিশ্বাস এই খোলা জানালার আলো হাওয়ায় সম্পৃক্ত হবেন সারা বিশ্বের বাঙালি পাঠক এক দিন। আমার অন্তরের শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই বাতায়ন পরিবারের সব সদস্যকে।

## সংগীত

## সুরেরই ভাষা, ছন্দেরই ভাষা –

একুশে ফেব্রুয়ারী ছিল আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। পৃথিবীতে আবির্ভাবের কাল থেকে আজ অবধি মানুষের সভ্যতার ইতিহাস পড়লে দেখা যায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার তাগিদটি তার এক আদিম প্রকৃতি। সেই তাগিদ থেকেই গুহামানব ছবি এঁকে সঙ্গীদের বোঝাতে চাইত নানা কথা। তিনটি হরিণ শিকার করা হয়েছে আজ। এ বনের পশ্চিম প্রান্তে একপাল বুনো মোষ চরতে দেখা গেছে। বাদুলে মেঘ জমেছে আকাশে। হয় তো এমনধারা নানা বিষয়ই পাথরে, মাটিতে বা গাছের গুঁড়িতে আঁচড় কেটে বোঝাতে চাইত সে। এ তথ্য আজ সকলেরই জানা যে ভাষা তাদের ছিল না বটে কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা তাদেরও ছিল। শব্দ নয়, ছবির সাহায্যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের কাজটি সমাধা করত আদিম গুহাবাসী। স্পেনের আলতামিরার গুহাচিত্র দেখার জন্য পর্যটকদের ভিড় লেগেই আছে এখন।

পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার এই তাগিদ থেকেই যে ভাষার সৃষ্টি একথা মেনে নেওয়া যেতে পারে। সে তাগিদ গোড়ার দিকে হয়তো ছিল নিছকই জীবনধারণের প্রয়োজন মেটান। নিজের থেকে বলশালী জন্তুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকা। ক্রমশঃ তার সে প্রয়োজন কমে এল। ভাষা তখন প্রধানত মনের অনুভূতি, চিন্তা, ভাবনা প্রকাশের হাতিয়ার হয়ে উঠল। তৈরী হল এক শিল্প মাধ্যম যা পুরোপুরি ভাষা নির্ভর। সেই শিল্প মাধ্যমটির নাম সাহিত্য। প্রতিদিন বিভিন্ন মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে চলেছে। মানুষে মানুষে যোগাযোগ ঘটছে কথ্য ভাষার মাধ্যমে। এছাড়াও লেখা হচ্ছে অসংখ্য গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি। চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে। প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্র এবং নানাবিধ পত্রপত্রিকা। এ সবার মধ্যে ধরা থাকছে নানাজনের ধ্যান ধারণা, ভাব-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি। একের চিন্তা আরো অনেকের সঙ্গে ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মূলত একটি ভাষার ব্যবহার প্রচলিত হলেও শুধু সেই গণ্টুকুর মধ্যেই ভাষাটির চলন ও বিস্তার সীমাবদ্ধ নয়। বিশেষতঃ এই আন্তর্জালের যুগে তো নয়ই। অন্য নানা ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে আর সেইসব শব্দ আত্মীকরণ করে সমৃদ্ধ হয় একটি ভাষা। বাংলা ভাষায় তার ব্যতিক্রম নয়। সরাসরি বাংলা ভাষার প্রসঙ্গটি টানলাম কেন? আমি জন্মসূত্রে বাঙালী। বাংলা ভাষা আমার মাতৃভাষা। আমার মতো আরো অনেক বাঙালীর সুরের ভাষা, ছন্দের ভাষা আর আনন্দের ভাষা হল বাংলা। এ ভাষার ইতিহাস সুপ্রাচীন। নানা ভাঙাগড়া আর ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলা ভাষা। আর এই গতিময়তাই ভাষাটির বেঁচে থাকার লক্ষণ। বাংলা ভাষার চলার পথে যেমন আছে আনন্দঘন নানা মুহূর্ত, তেমনি আছে কিছু ব্যথাদীর্ঘ সময়। নানা রঙের সুতোয় বোনা ঠিক যেন বাংলার নাকশী কাঁথাটি! একুশের স্মৃতি বেদনার। পৃথিবীর যে যে প্রান্তে বাংলা ভাষা নিয়ে যে কাজই করুন সে দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের তরুণ শহীদদের অম্লত্যাগ তাঁদের সকলের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।



বাতায়নের পঞ্চদশ সংখ্যা “পলাশের রং” ঋতুবদলের কথা মাথায় রেখে সাজান হল। প্রথম ও শেষের প্রচ্ছদে তাই বসন্তের প্রাণের উচ্ছাস, আলোকচিত্রে ‘রাঙা নেশা’র ঘোর। ছোট গল্প, নানা স্বাদের কবিতা আর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে এই সংখ্যায়। তিতাস মাহমুদের ভাষা সম্বন্ধে রচনাটি ওনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। রচনাটি চিন্তার একটা নতুন দিক খুলে দেয় – শুধু শব্দই কি ভাষার আধার হাতে পারে? নৈঃশব্দ্যেরও বোধহয় নিজস্ব ভাষা আছে। কেমন সে ভাষা? সে ভাবনা আগামীদিনের জন্য তোলা থাক। এ নিয়ে পাঠকদের চিন্তা জানার অপেক্ষায় রইলাম।

দোল আসছে সামনে। আবীরমাখা শুভেচ্ছা তাই সকলের জন্য। বহুযুগ আগে যে অনুরাগে দোলা লেগেছিল যমুনায় বিভেদ ভুলে সেই অনুরাগে সকলে রঙ্গীন হয়ে উঠুন এই কামনা আমাদের।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

শিকাগো, ইলিনয়

বাতায়ন সম্পাদিকা, বাংলা বিভাগ

# সূচীপত্র

## Bangla Section

— কবিতা —			
সুজয় দত্ত	10	অভীক মজুমদার	24
ফিরে এসো কবিতা		দরগা	
মানস ঘোষ	11	গান	24
শুরু হোক		— গল্প —	
উদালক ভরদ্বাজ	12	ইন্দ্রাণী দত্ত	25
প্রয়াস		পিং-পং	
রবিরশ্মি ঘোষ	14	অতীশ ব্যানার্জী	29
ব্রজবুলি গান		বিধাতার ছুটি	
সঞ্জয় চক্রবর্তী	15	দেবশ্রী মিত্র	32
ভোর		গুলাবচন্দ কিরানা স্টোর্স	
দেবশিস ব্যানার্জী	16	মঞ্জিষ্ঠা রায়	34
অসুখ		পাহাড়ী আতঙ্ক	
শুভ্র দাস	17	— অনুগল্প —	
বিদায়		তপনজ্যোতি মিত্র	37
অর্পিতা চ্যাটার্জী	18	অমৃতের সন্তানসন্ততি	
রোদের বাড়ি		— প্রবন্ধ —	
শুভ্র দত্ত	19	তিতাস মাহমুদ	39
লিমেরিক		ভাষা দিবস	
রজত ভট্টাচার্য	21	অর্পিতা চ্যাটার্জী	40
লিমেরিক		অসমাপ্ত শত্রুতা	
সৌমিত্র চক্রবর্তী	22	— রম্যরচনা —	
আজকাল		আনন্দম শাস্ত্রী	44
স্নেহাশিস ভট্টাচার্য	23	কলকাতা একাত্তর	
খোঁজ		বইমেলায় একদিন	47
		স্নেহাশিস ভট্টাচার্য	





---

## *English Section*

---

Shuvra Das	50	Jill Charles	57
<b>Unfinished Stories</b>		<b>Mary Oliver: Wild and Precious Life</b>	
Madhurima Das	51	Susim Munshi	59
<b>Makerspace</b>		<b>Essays from The Education of a Bengali Gentleman — The Unexpected Benefits of Breakfast after Retirement</b>	
Kathy Powers	53		
<b>Some Nouns</b>		Souvik Dutta	61
Jerry Kaiser	54	<b>Purusha Suktam —</b>	
<b>Postman Butterfly</b>		<b>Explanation of the First Six Verses</b>	
M. C. Rydel	55	Jill Charles	69
<b>The Fabric of Coincidence</b>		<b>Arrival — Movie Review</b>	

## সুজয় দত্ত

## ফিরে এসো কবিতা

যতদিন ছিলে আমার কলমে বাঁধা,  
তুমি যেন দাসী, আর আমি এক প্রভু —  
পরিয়েছি পায়ে যতি-ছন্দের বেড়ি  
মুক্ত বাতাসে উড়তে দিইনি কভু ।

বাজারী কাগজে শৌখিন ম্যাগাজিনে  
তোমাকেই বেচে কুড়িয়েছি হাততালি ।  
বুঝিনি কখনো তুমি ছেড়ে চলে গেলে  
মানিব্যাগ নয়, হৃদয়টা হবে খালি ।

বুকের খাঁচায় বন্দিনী পাখী হয়ে  
দিয়ে যাবে শিস্ আমার হুকুমমতো —  
এই ভেবে আর খাঁচার দরজা খুলে  
জানতে চাইনি যাতনা পেয়েছো কত ।

যেদিন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখি  
নেই তুমি আর, উড়ে গেছ কোন ফাঁকে —  
মনের ভেতর কী অসীম শূন্যতা  
হাহাকার করে তোমাকেই শুধু ডাকে ।

সেই থেকে আর পাইনি তোমার দেখা ।  
দিন কেটে যায় পথ চেয়ে কাল গুনে —  
বর্ষায় যদি মেঘদূত হয়ে আসো,  
ফেরো যদি কোনো হেমন্তে ফাল্গুনে ।

আসবে না জানি, মুক্ত বলাকা হয়ে  
নীল আকাশের রংটুকু শুষে নেবে,  
নন্দনবনে পারিজাতফুল-সম  
আপন খুশীতে গন্ধ ছড়িয়ে দেবে ।

সেই ভাল, আর মিছিমিছি পিছু ডেকে  
মিথ্যে আশায়, রবনা তোমায় নিয়ে ।  
হঠাৎ কখনো ইচ্ছে জাগলে শুধু  
চুপি চুপি যেও আমার স্বপন ছুঁয়ে ।



**সুজয় দত্ত** — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মিটিক্স) ওপর গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পুঁজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি “প্রবাসবন্ধু” ও “দুকুল” পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।



## মানস ঘোষ

## শুরু হোক

দূর কিছু নয় যেখানেই থাকো, শিকাগো বা চীনা তাইপেই,  
 খোজুরে আলাপে জুড়েছ আড্ডা আলপিন থেকে স্কাইপেই ।  
 পৃথিবীটা যেন গুটিসুটি মেরে, মোবাইলে ঢুকে বন্দী,  
 শিবপুর থেকে সিডনী-পার্শে, রেসিপি বা কানে ফোন দি ।

তবু,

হয়তো বা কোনো বিষাদ বিকেলে, মনে পড়ে সেই ধুলোমাঠ ।  
 গলিপথ, স্কুল, লাটাই এর সাথে, কিশোর আকাশে খোলাছাত ।  
 মুখে ফেরে শুধু প্রিয় ভাষাখানি যেটুকু শিখেছি ভালোবেসে ।  
 মন কেমনের খড়কুটো ওড়ে, আঁকড়ে ধরেছি পরবাসে ।

তাই,

পুলকিত প্রাণে আজ বাতায়নে,  
 বাংলায় লিখি কবিতা ।  
 সৃষ্টি সুখের বেহিসেবে লিখি,  
 মনে যা যা আসে সবই তা !

জেনো,

নিভৃত যতনে রেখেছি গোপনে, রত্ন কৌটো বন্ধ,  
 মায়ের পুরোনো শাড়ীর আঁচলে মাতৃভাষার গন্ধ ।



মানস ঘোষ । মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের “ট্রেনচালক” । এই গ্রন্থে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে । জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ব করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা ‘বাতায়ন’ পাশে, আমাদের মাঝে ।

## উদালক ভরদ্বাজ

### প্রয়াস

বৃষ্টি থামল নাকি,  
দেখ তো !  
ইস, বারান্দাটা একেবারে থই থই . . .  
শুকনো মাটির দুঃখ এবার  
ঘুচলো বোধ হয় ।  
বাদাম গাছটা এবারে কেমন  
যেন কম উজ্জ্বল, দেখেছ?

এই !  
বনোয়ারিকে বল না গো -  
পার্কের ওই বাদামওয়ালার কাছ থেকে  
পাঁচ টাকার বাদাম নিয়ে আসুক ।  
আমি তেলেভাজা বানাবো . . .

চা বানাই ? খাবে ?  
কি হল তোমার আবার ?  
মুখ গোমড়া করে বসে আছ যে !  
ওই মেয়েটার মেল এসেছে নিশ্চই  
কি যে কর নিখিল . . .

এই, মনে আছে ?  
এক দিন, তুমি আর আমি  
গোরা-র রিহাসালের পরে  
আইসক্রিমওয়ালার পেছনে দৌড়তে

দৌড়তে শেষে যখন ধরলাম তাকে -  
সে বলল, সে সারাইয়ের লোক -  
ভেঙে গেছে গাড়ি  
ঠাণ্ডা হয় না আর  
তাই নিয়ে যাচ্ছে -  
গ্যারাজে . . .  
“ঠালাগাড়ির গ্যারাজ”, বলে  
কি হাসিটাই হেসেছিলাম  
সেদিন ।

আর তার পর,  
বুড়ো বাদামওয়ার থেকে -  
হুমড়ি খেয়ে,  
প্রায় কুড়ি টাকার বাদাম খেয়েছিলাম  
তিন ঘণ্টায় . . .  
মনে আছে ?

কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিলে তুমি  
প্রথম সেদিন -  
শিমুলতলা, উড়ে পড়া ফুল . . .

এই নিখিল, আজ প্লিজ,  
চল না, এক বার, পার্কে যাই !  
দেখ, বৃষ্টি এফুনি শুকিয়ে যাবে ।



এই বর্ষার সবুজ দেখতে  
আমার কি যে ভাল লাগে !

অন্য সময় জান তো,  
জানতেই পারি না

এত রকমের সবুজ হয় . . .

শুধু এই বর্ষাই দেয় সেই সুযোগ ।

এই, চল না প্লিজ !

আমি যে আর কারও হাত

ধরি নি কখনও নিখিল !

পারিই নি ধরতে

পারি না তো !

এক দিন, এইটুকু

দাও না, আমায় ?

নিখিল...

কোলে মাথা রাখতে হবে না, হি হি

আজ তো এমনিতেও কাদা . . .

একটু হাত ধরলেই হবে;

কত দিন চলি না সে ভাবে . . .



এম ডি এন্ডারসন ক্যাসার সেন্টার-এ ক্যাসার বিষয়ে গবেষণায় রত উদ্দালক অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন । উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাস বন্ধু, দুকূল, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, বাতায়ন ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে । কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব । কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি । সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে । স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন ।

## রবিরশ্মি ঘোষ

## ব্রজবুলি গান

(১)

উদিলে ভানু জাগিলা কানু রাই স্বপন ত্যজিয়া ।  
 কুঞ্জ মাঝে গাহে পিক আপন পিয়ার লাগিয়া ।।  
 কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম পুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জে গাহিয়া ।  
 ছলত ছলত তটিনী চলত মৃদুল চালে বহিয়া ।।  
 আওল সখী শ্যাম সঙ্গ খেলিব ফাগ রাঙিয়া ।  
 নাচিব গাহিব মাতিব আজি হৃদয় দুয়ার ভাঙিয়া ।।  
 খেলিব হোরি অতি আনন্দ মধুর ছন্দ বাজিছে ।  
 দেখ চাহি সখী রাধার সনে শ্রী গোবিন্দ নাচিছে ।।  
 কাটিল রজনী আও সজনী সুনহ শ্যামের বাঁশরী ।  
 আম্র কুঞ্জে পবন সঙ্গ খেলত আম্র মঞ্জরী ।।

(২)

আওত সাঁঝ গগন উঠিছে গভীর লাজে রাঙিয়া,  
 সে গগন হেরি হিয়া আজু মোর দেখহ উঠিছে কাঁপিয়া ।  
 সখী রি, আজু এ রজনী কাটিবে কেমনে কানহার বাঁশুরি বিনে?  
 কানহা তো অবহুঁ মথুরা নগরবাসী বীচ মে বহত রহি যমুনা সর্বনাশী ।  
 দুঃখে আজু মোর চিত্ত বিকল  
 শিথিল হইল অঙ্গ সকল ।  
 সখী রি, আজু এ রজনী কাটিবে কেমনে কানহার বাঁশুরি বিনে?



সিডনিতে কর্মরত রবিরশ্মি ঘোষ এর লেখার জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ ইংরেজিতে লেখা উপন্যাস “দ্য গডস অফ সুমেরু” দিয়ে। তারপর শুরু হয় বাংলায় কবিতা, গান, ছোটগল্প ও নাটক লেখা। লেখার বিষয় হিসাবে বিশেষ ভাবে পছন্দ ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক পটভূমিকায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। কবিতা লেখায় বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা চালাতে আগ্রহী এবং কবিতার মাধ্যমে গল্প বলতে তার বিশেষ পছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দ।



## সঞ্জয় চক্রবর্তী

## ভোর

মুঠোয় ভরে নীহারিকার আলো  
পায়ে পায়ে পেরিয়ে গেছে রাত,  
ভোরের রাতে বিদ্যুতচমকালো  
মেঘের বুকে ক্ষণিক অকস্মাত,  
হয়ত সে আজ বার্তাবাহক তোমার  
এক জীবনের সময়পঞ্জিকায়,  
তমসাঘন সুপ্ত জীবনদানি  
ফেরাও তোমার  
আলোকবর্তিকায়,  
ক্লান্ত জীবন আজও চরৈবতি,  
পথ থামেনি, ভরসা তোমার থেকে,  
ক্ষুদ্রতাময় জীবনের সঙ্গতি  
নিক্তি মাপে সামঞ্জস্য রেখে,  
লুকিয়ে রাখা মনের সঙ্গোপনে  
তোমার ছোঁয়ায় কাটুক যত শোক,  
এক সকালের বৃষ্টিম্নাত মনে  
তরুন দিনের অরুণোদয় হোক ।



সঞ্জয় চক্রবর্তী অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

## দেবশীষ ব্যানার্জী অসুখ

এক সারি লাল পিঁপড়ে,  
চ্যাট চ্যাটে রক্তের দাগ ... শর্করা,  
আর নেই ...  
ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে ফিনাইল দুধ,  
ওষুধের শিশি, হলদেটে মলমের খাপ ।  
শিশুর করতালু থেকে উপড়ে ফেললাম  
বারুদ আর পশমের বুন্ট,  
অস্ত্রশস্ত্রের গায়ে লাগে  
পরাজিত অসুখ,  
অস্পষ্ট ছাপ ।

টুকরো কাঁচ, অভ্র-শলাকা,  
আর নেই ...  
গুনো, বুরবুরে ছাঁকা বালি,  
হেঁটে যেতে যেতে ...  
ঝরে না লালচে নক্ষত্র বীজ ...  
আকাশে পদচিহ্ন রাখে গ্রহরী,  
কবিতারা ফুটবেনা আর ।



দেবশীষ পেশায় পদার্থবিদ্যার গবেষক, তবে যতটুকু সময়ের ফাঁকফোকর তাতে শুধু কবিতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আর সাহিত্যের ছাত্র হবার বাসনা । দেবশীষের লেখা কিছু লিটল-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে । দেবশীষ সপরিবারে মিশিগানের বাসিন্দা ।

শুভ্র দাস

বিদায়

ওরা যেন সকলে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে  
উঠে বললো “আসি আজ তবে  
কখনো হয়তো আবার দেখা হবে।”  
অতসী মামী কলঘর থেকে  
এসে শুয়ে পড়লেন, চিরকালের মতো ।  
রোজ রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যেতেন মিলন কাকু;  
কাকুর কিডনিরা একদিন দোকানের বাঁপ ফেলে দিলো ।  
অনেকবছরের হার্টএর অসুখ সাবধানে সামলে  
মেসো শেষ পর্যন্ত ঘুমের মধ্যে, মাথায় রক্ত উঠে.....  
সেভাবেই একে একে উঠে চলে গেলেন  
মৃনাল, দিব্যেন্দু, নীরেন্দ্রনাথ, মেরি, অতীনেরা ।  
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ঘুরে গেলো আরও কিছু আপনার জন ।

ঠিক যেমন বছর কুড়ি আগের সেই পুজোর সময়;  
তরুণ-তাজা মানুষগুলো সব বেরিয়ে পড়তে চাইছিলো,  
কেউ নৈনিতাল, কেউ আখা, কেউ দেওঘর  
কুণ্ডুস্পেশালে কেউ, কেউবা রাজধানীতে  
সকলেই যেন পণ করেছে “ঘরের মাঝে থাকবো না আর ।”



শুভ্র দাস গত তেইশ বছর ডেট্রয়ট, মিশিগান নিবাসী । পেশায় মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রফেসর । জন্ম ও ছোটবেলা কেটেছে হাওড়ায় । পড়াশোনা খড়গপুর আই আই টি ও আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে । নেশার মধ্যে ছবি তোলা ও ছবি আঁকা, লেখা লেখি, ঘুরে বেড়ানো, নাটক ও পলিটিস্স । বর্তমানে রেসিস্টেন্স মুভমেন্টে অনেক সময় কাটছে ।



## অর্পিতা চ্যাটার্জী

### রোদের বাড়ি

ঝাপসা কাঁচের বিকেলবেলায়,  
স্যাঁতস্যাঁতে রোদ ছুঁয়ে নামে।  
কাঁচের ঘরে ডাইনে বামে,  
চু কিতকিত পাল্লা জমে।

রোদের বাড়ি অনেকদূরে।  
সেই যেখানে সন্ধ্যা হলেই  
পুটসঝাড়ে ঝাঁ ঝাঁ ডাকে।  
সেই যেখানে কালবোশেখি  
আমমুকুলে বোশেখ মাখে।

সেই যেখানে গয়না বড়ি  
রোদ মেখে যায় পোস্ত থালায়।  
সেই যেখানে হুটোপুটি স্নান  
পুকুরঘাটে আর আঘাটায়।

সেই যেখানে অন্ধকারে  
তালগাছেতে জোনাক জ্বলে।  
মিটমিটিয়ে বুদ্ধ-ভূতম,  
রাজকাহিনী আউড়ে চলে।

রোদের বাড়ি সবুজ গাঁয়ে,  
রোদের বাড়ি ছোট।  
রোদের বাড়ি সাতসকালে  
পায়রা জোটে যত।

উঠোন ভরা গম খেয়ে যায়  
রোদের মায়ের থেকে।  
ঘরছাড়া এক কাঠবেড়ালী  
ফেরার চিঠি লেখে।

রোদের বিকেল দুই বিনুনী  
বৌবসন্ত, গোল্লাছুট।  
আড়ি-ভাব আর ঝগড়াঝাঁটি  
মনপুকুরে একলা ডুব।  
ফি বুধবার সন্ধ্যাবেলায়  
হারমোনিয়াম, কাঠের রিড।  
রোদের ভেতর সুর ছুঁয়ে যায়,  
একলা থাকার সেইতো জিদ।

একলাটি রোদ ইকিড়মিকিড়  
অনেকটা পথ চলার বাকি।  
একলা রোদের কাঁধ ছুঁয়ে যায়,  
রোদের বাড়ির সেই জোনাকী।  
রোদের এখন সামলে চলা,  
রোদের এখন নেই জিরোন।  
রোদের এখন আবছা আকাশ,  
বাড়ির চিঠির শেষ পিয়ন।



**Arpita Chatterjee** — Postdoctoral Research Associate, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE-68198

## শুভ্র দত্ত

## লিমেরিক

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভড়কে গেলাম ও ভুতুড়ে চেহারা দেখে  
 আধটেকো মাথা খোঁচা খোঁচা দাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে এ কে?  
 বুঝলাম শেষে মাথা স্থির হলে  
 বছরটা শেষ হয়ে গেছে বলে  
 ক্যালেন্ডারটা সরানো হয়েছে আয়নার পর থেকে।

এটা তো ঢোকে মাথায় না  
 ভেবে ভেবে বোঝা যায় না  
 কেন লোকটা সে  
 অন্ধের দেশে  
 বিলিয়ে বেড়ায় আয়না!

আয়নায় দেখি ওই লোকটাকে, - টেকো, মোটা আর বেঁটে  
 দেখলেই পরে গা-টা রি-রি করে, মেজাজটা যায় ঘেঁটে  
 পেয়েছি এবার সমাধান তার  
 এক হিরোর ছবি করেছি জোগাড়  
 ওই ছবিটাই আয়নার পরে দেবো এইবার সঁটে।

চিড়িয়াখানার এপ্ হল্-এ নানা বনমানুষের ডেরা  
 ওরাং-ওটাং, গোরিলা, ও আরো লেজহীন বানরেরা  
 সব শেষে দেখি আছে শুধু রাখা  
 একটি আয়না, তার নিচে লেখা  
 ‘ভয়ানক জীব, হিংস্রতায় এ সকল প্রাণীর সেরা’।

‘আরে গেল গেল  
 তোর কানটা তো  
 নিয়ে উড়ে গেল কাকে’,  
 একথা শুনেই কাকের পিছনে  
 লোকটা ছুটতে থাকে।  
 শুনে হাসছিস? তা আচ্ছা, হাস,

লোকটা কে সেটা জানতে কি চাস?  
 ওই যে সামনে আয়না রয়েছে,  
 ওতেই দেখে নে তাকে।  
 শেভিং করার আয়নাতে দেখি  
 শুধু মুখ, মোটা চশমাটা নাকে  
 পানের দোকানে আয়না মাঝারি,  
 দেখা যায় তবু হাফ-বডিটাকে  
 স্যুটের দোকানে বড় আয়নায়  
 মাথা থেকে পা-ও পুরো দেখা যায়,  
 তবু ভাবি, কোথা আছে সে আয়না,  
 যাতে দেখা যাবে পূর্ণ আমাকে।

নিজেকে দেখতে ফিট কেই বা চায় না?  
 তাই বলে খাওয়াদাওয়া কমানো যায় না।  
 জিমে যাওয়া, সেও হ্যাঁপা,  
 তার চেয়ে, ওরে খ্যাঁপা,  
 কিনে ফ্যাল ঠিকমতো বাঁকানো আয়না।

আয়নার এ পাশে যে আমি রয়েছেি, সে আমি দিব্যি আছি তো এই  
 আয়নার ও পাশে আছে যেই আমি, সে আমি তো জানি থেকেও নেই  
 ওই আয়নার আড়ালে ওধারে  
 তুমিই কি তবে ছিলে চুপিসাড়ে  
 আয়নাই ছিল পথ রোধ করে, দেখতে পাইনি সে কারণেই !

কাঠের ফ্রেমের আয়নাখানা দেখলে পরেই মেজাজ চড়ে  
 ওই আয়নায় যতই তাকাই ততই বুড়োই একটু করে  
 ব্যাপার যখন এমন করুণ  
 মাথায় এলো বুদ্ধি দারুণ  
 যুবক কালের একটা ছবি দিলাম সঁটে ওটার পরে।

---

**শুভ্র দত্ত** — সিয়াটেলের বাসিন্দা, পেশায় রোবটিক্স প্রযুক্তিবিদ, আর নেশায় লিমেরিকবি, অর্থাৎ লিমেরিক লেখেন এমন কবি।

তার চেয়ে একটু বিশদে বলতে গেলে — শুভ্র দত্ত আদতে কলকাতার ছেলে, পরে সিয়াটেল শহরের প্রায় তিন-দশকের বাসিন্দা। নানা সময়ে নানারকম পেশায় পা গলিয়েছেন — মহাকাশ বিজ্ঞান, ক্যামেরার ব্যবসা, বায়োমেডিকাল প্রযুক্তি, রোবটিক্স, ইত্যাদি প্রভৃতি। নেশাও নানান ধরনের; তার মধ্যে আছে ছবি তোলা, বাংলা বই পড়া, যন্ত্রপাতি তৈরী করা, ওয়েবসাইট বানানো, এবং অনর্থক অর্থহীন লিমেরিক লেখা।  
 বাংলিমেরিক ডট কম (BangLimeric.com) ওয়েবসাইট ওনারই সৃষ্টি।

---



## রজত ভট্টাচার্য লিমেরিক

দু পান্ডর চেখে  
খুড়ো উঠলো হঠাৎ ফেপে  
ব'লে মেঘের খোকা ধরতে যাবো  
মোটর গাড়ি চেপে ॥

খুড়ি শুনছিল চুপ বসে  
এখন আঁচল খানি কষে  
বললে আমার হাড় জুড়োবে  
গেলে মেঘের দেশে ॥

ওমনি একটু হেসে  
খুড়ো বললো একটু কেশে  
তুমিও যেমন —  
সত্যি ভাবলে শেষে ॥



রজত ভট্টাচার্য, নিভৃত সাহিত্যচর্চা আর দুর্গম পাহাড়ে ভ্রমণ তাঁর ভালোলাগা। গদ্য ও পদ্যে সমান দক্ষ। পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী। তাঁর গদ্যের অভিনব শৈলী বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

## সৌমিত্র চক্রবর্তী

## আজকাল

প্রেমের আর বয়স নেই  
 ভালোবাসবার আছে,  
 নদী, নারী, বর্ষা কাউকেই ভয় নেই এখন।  
 যেন আমি আর তারা অন্য কেউ,  
 ভাবতে পারি আজকাল।  
 হর্ষবর্ধনের মতো  
 দিতে পারি ভালোবাসার পোশাক  
 অক্লেশে, অনায়াস  
 অন্যের পাশে প্রিয় নারী  
 আহা ! বেশ লাগে !  
 নদীতে না গিয়েই নৌকো  
 বর্ষায় না ভিজেই বৃষ্টি এমনই ইদানীং  
 শুধু ভালোবাসছি বলেই একটা কবিতাও না লিখে  
 বলে উঠি আমি কবি।  
 রাতের ছাদে দাঁড়াই  
 আমার গা বেয়ে নেমে আসতে থাকে অলক্ষিতে চাঁদ . . .  
 তাকে সযত্নে আকাশ দিয়ে বলি, – প্রেমের আর বয়স নেই  
 ভালোবাসবার আছে।



সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার ‘খেলার ছলে’ পত্রিকার মূল কাভারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই ‘দেশ’, শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

## স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

## খোঁজ

ভালোবাসা, -  
 এক অদ্ভুত বিশ্বাস নিয়ে বয়ে চলা . . .  
 সেই অন্ধকার থেকে, আদম আদিম সময়কে আঁকড়ে নিয়ে  
 শরীরের বিভঙ্গে, ঠোঁটের আর্দ্রতায়  
 নোনতা ঘামে,  
 কামগন্ধে মোহরুপী রিপুর হাতছানি  
 তোমায় ভালোবাসতে চায় ।

ভালোবাসা . . .  
 অনেকটাই অন্যভাবে হাজির হয়েছিল তোমার হাত ধরে ।  
 আজো হলুদ শাড়ির তুমি আমার চোখের অন্তরে ।  
 আনকোরা নতুন সে পথ  
 ঐক্যেবঁকে চলে গেছে হারানো দিশায়,  
 পিচ রাস্তা থেকে গঙ্গার কিনারায় . . .  
 থমকে যাওয়া সময়  
 চোখ রাঙায় ।  
 ভালোবাসা  
 অভ্যাসে তবু . . .

. . . ভালোবাসা  
 তবুও তো  
 শুধুমাত্র দু দন্ড সময়  
 ফিরে যেতে চায়  
 সেই মনে . . .  
 আজও মন যেখানে হারায় ।



**স্নেহাশিস ভট্টাচার্য** । কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী । বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শন ভবনে কর্মরত । বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা । পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বৃষ্টি সন্ধ্যায় আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে । সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে . . .



## অভীক মজুমদার

### দরগা

সেলিম চিস্তির দরগা ।  
কাওয়ালি গানের সুর ভেসে আসে ।  
আলো নাচে নকশাকাটা থামে ।

চতুরে যে-কাঠবিড়ালি  
খেলা করে  
তাকে বলি  
বুলন্দ-দরওয়াজা খোলো  
আমার বুকের

দু-একখানা সূর্যরশ্মি ঢালো  
যদি  
আজানু প্রগতি হয়ে

মিশে যেতে পারি  
গন্ধে

ধূপে পথে  
হারমোনিয়ামে . . .

### গান

আমার বুকের মধ্যে  
গান এসে বসে  
উড়ে যায়

জয়পুর শহরে দেখা  
শাদা ঘুড়ি, হলদে ঘুড়ি  
যেরকম . . . .

শেষে ওরা ক্রমশ ছড়ালো  
শরীরে, মাজারে, পথে  
সমুদ্রে, গুম্ফায়

অগ্রহায়ণের রোদে  
হুমায়ুন সমাধিতে  
অতন্দ্র চিরাগ  
জ্বলে দিতে . . . .

মেঘে, ঐ যে, ফুঁ-লাগিয়ে অরণ্য বানায় . . . .

## ইন্দ্রাণী দত্ত

### পিং-পং

সন চোদোশো পঁচিশের গ্রীষ্মসন্ধ্যায় পিয়ালী আর অনিন্দ্য নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য প্রায় তৈরি। পিয়ালী আয়নার সামনে – চুল আলতো জড়িয়ে ঘাড়ের ওপর তুলে ফ্রেঞ্চ নট বাঁধছে – দু এক গুছি রূপোলি রেখা সিঁথির পাশে। অনিন্দ্য রেডি অনেকক্ষণ – তাড়া দিচ্ছে।

পিয়ালী শাড়ি ঠিক করতে করতে বলল – ‘এত কিসের তাড়া ! যাচ্ছ তো হস্টেলের রুমমেটের বাড়ি মানে আমাদের মতই বুড়ো আর বুড়ি – এক্স গার্লফ্রেন্ড ট্রেন্ড হলেও বুঝাতাম’। অনিন্দ্য ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছিল। নিজে নিজেই হাসছিল পিয়ালী – শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে। ওর হাসি মশকরায় অনিন্দ্য যোগ দেবে না – পিয়ালী জানে। অনিন্দ্যকে কোনদিন হাসতেই দেখে নি পিয়ালী, রসিকতা করতেও নয়। বস্তুত অনিন্দ্যর খুব খুশি খুশি একটা মুখ পিয়ালী মনেই করতে পারে না। অ্যালবামে ওদের যুগল ছবি – ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ব্যাকড্রপ অথবা সমুদ্রের বালিতে বসে ওরা দুজন, কিসা ঘোড়ায় চড়ে লাল নীল টুপি মাথায় বিটু পিটু – দুপাশে অনিন্দ্য পিয়ালী – কোনো ছবিতেই অনিন্দ্য হাসিমুখ নয় – একটু আড়ষ্ট যেন, হয়ত সামান্য নতমুখ কোথাও। অথচ সেই অর্থে অনিন্দ্যর অপ্রাপ্তি কিছু নেই – এই বয়সে ওর মতো ছেলের জাগতিক যা কিছু পাওয়ার – সবই পেয়েছে – পিয়ালীর বা আত্মীয়স্বজনের অন্তত সেরকমই মনে হয়। পিয়ালীর বিয়ে হয়েছে প্রায় পঁচিশ বছর – বিটু পিটুও ছোটো থেকে বড় হয়ে কলেজ, ইউনিভার্সিটি পৌঁছে গেল – এত বছরে অনিন্দ্যকে হাসতে দেখল না পিয়ালী। সে যে অতীব গম্ভীর, দাঁত খিঁচোচ্ছে সর্বদা – এমনও নয়। শান্ত শিষ্ট ভদ্র দায়িত্বশীল – কিন্তু নিরুত্তাপ। খুব বেশি বন্ধুবান্ধবও নেই – ঐ অফিসের সহকর্মী দু তিনজন। স্কুল কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। উৎসব বা ঘরোয়া জমায়েতে অনিন্দ্য বরাবরই চুপচাপ-উপহার দিয়ে, ফাস্ট ব্যাচে খেয়ে আচ্ছা আসি, নমস্কার – ব্যাস। এই পঁচিশ বছরে পিয়ালীর মনে হয়েছে, অনিন্দ্য যেন বর্মাবৃত – অদৃশ্য এক বর্ম তাকে ঘিরে রয়েছে অনুক্ষণ – আর সেই বর্ম ভেদের অস্ত্র পিয়ালীর তুণে নেই। কখনও আবার মনে হ’ত, যেন এক গভীর বনে প্রাচীন বৃক্ষরাজির তলায় অনিন্দ্য এক শ্যাওলা ধরা প্রাচীন পাথর – তার পাশ দিয়ে, কখনও উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে হরিণ, কখনও বাঘ – পাথরের পিঠে রোদ পড়ে না, শ্যাওলা জমে জমে সবুজ। বস্তুত, বিয়ের পরেই পিয়ালী তার নতুন বরের আত্মগণ্ডতা খেয়াল ক’রে নিজের কলেজ আর ইউনিভার্সিটির পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে তুলনায় বসে ও আশ্চর্য হয়। অনিন্দ্যর বাবা নীলমাধবকে এক বিকেলে চা দিতে গিয়ে সে সটান জিগ্যেস করে – ‘আচ্ছা, আপনার ছেলে কি বরাবরই এরকম?’

নীলমাধব পিয়ালীর চোখে চোখ রেখে বলেন, ‘কী রকম? বি স্পেসিফিক বৌমা।’

– ‘না এই চুপচাপ মত’

– ‘বাবু একটু ইন্ট্রোভার্ট – তাতে প্রবলেম কোথায়? তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ট্যবহার করছে না কি?’

– ‘তা নয় মানে বলছিলাম, আপনাদের ছেলে কি বরাবরই এই রকম? ইন্ট্রোভার্ট নয়, ওকে একটু উদাসীন মনে হয় আমার, আসলে।’

– ‘বরাবর আর দেখলাম কোথায় বৌমা? তোমার শাশুড়ি গত হলেন ওর সাত বছরে, তারপর থেকে মামাবাড়িতে আর হস্টেলে। এই তো কদিন বিয়ে হ’ল। একসঙ্গে থাকতে থাকতে সহজ হবে। একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিও – সবাই কি একরকম হয়, বৌমা?’



পঁচিশ বছর মানিয়ে গুছিয়ে কেটে গেছে পিয়ালীর, বর্মভেদ করার চেষ্টা বহুদিন ছেড়ে দিয়েছিল সে, বরং একটু ঝেড়েঝুড়ে ঘষে মেজে রাখত অনিন্দ্যর বর্ম – ওর মনে হ’ত ঐ বর্মই অনিন্দ্যর আসল বাড়ি – ঐখানেই যেন ভালো থাকে অনিন্দ্য।

আজ চোদ্দোশো পঁচিশের গ্রীষ্মসন্ধ্যায় এখন ওরা অঞ্জন আর স্নিগ্ধার বাড়ি যাচ্ছে। অঞ্জন হস্টেলে অনিন্দ্যর রুমমেট ছিল – একথা নীলমাধবের থেকেই জেনেছিল পিয়ালী। বিয়ের বছরখানেক পরে ওরা পুরী যাবে কদিনের জন্য – গোছগাছ করছিল; নীলমাধব ওর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়েছিলেন।

– ‘কিছু বলবেন? এই তো চা দেব এক্সুগি আর একটু গুছিয়ে নি – এই পাঁচ মিনিট’

– তাড়া দিতে আসি নাই বৌমা। একটা কথা বলি রে মা। পুরী যাচ্ছ, সমুদ্রে বেশি নেমো টেমো না।’

– ‘কেন, ওমা কেন? এ বাবা, পুরীতে গিয়ে সমুদ্রে নামব না?’

– ‘পা টা ভিজিও, বালিতে বসে থেকো – স্নান করো না। বাবুর জলে ফাঁড়া আছে বৌমা – তোমাকে কি ও বলেছে একবার ডুবে যাচ্ছিল দীঘায় গিয়ে?’

– ‘সে কি? কই না তো? কবে?’

– ‘কলেজে পড়ার সময়। সেকন্ড ইয়ার। অঞ্জন বাঁচিয়েছিল ওকে। অঞ্জন ওকে তুলে না আনলে . . . ওর কপালের একটা কাটা দাগ আছে না? ওটা তো ঐখানেই – বোল্ডারে ঘা খেয়ে –’

– ‘অঞ্জন কে?’

– ‘বাবুর বন্ধু। ওরা পড়ত একসঙ্গে, হস্টেলে এক ঘরেই থাকত। আমাদের বাড়িতেও আসত খুব এক সময়ে – এদিক ওদিক খুব বেড়াত দুজনে। ভালো টি টি প্লেয়ার ছিল অঞ্জন – ন্যাশনাল খেলেছিল। বাবুও ভাল খেলত – অঞ্জনের থেকেই শিখেছিল।’

মাঝে মাঝে বর্ম থেকে বেরোতো অনিন্দ্য। কুচিত। যেন শ্যাওলাধরা পাথরের পিঠে একফালি রোদ পড়ত কখনও কখনও। পুরী গিয়ে এইরকমই এক রাতে, বর্ম থেকে বেরিয়েছিল অনিন্দ্য। ঘনিষ্ঠ হয়েছিল বৌ-এর। আর পিয়ালী ওকে আঁকড়ে ধরে দীঘার কথা তুলেছিল, বলেছিল – ‘ডুবে গেলে কী হতো?’ অনিন্দ্যর পিঠে পিয়ালীর নখ বসে যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই অনিন্দ্য তার বর্ম পরে নেয়। পাশ ফিরে আলো জ্বালায় ও জল খায়। পিয়ালী বলেছিল – ‘কী হল?’

অনিন্দ্য উঠে ব্যালকনিতে গিয়েছিল। সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, ‘জানি না।’

আজ এত বছর পরে ওরা অঞ্জনদের বাড়ি নিমন্ত্রণরক্ষায় যাচ্ছে।

দুদিন আগে অনিন্দ্য বাড়ি ফিরে বলেছিল – ‘আমার সেই কলেজের বন্ধু অঞ্জন, মনে আছে?’

পিয়ালীর পুরী স্মৃতি ফিরে এসেছিল – বলেছিল, ‘মনে রাখার মত কোনো কথা হয়েছিল?’

– ‘ও হয় নি! তাই তো। আচ্ছা ঐ ওরা মানে অঞ্জন আর স্নিগ্ধা ওদের বাড়ি যেতে বলেছে রোববার। যাবে তুমি?’

– ‘ওরা কি বাইরে কোথাও ছিলেন এতদিন? মানে এতদিন যোগাযোগ ছিল না তাই বলছি . . .’



– ‘ছিল তো – ছিল যোগাযোগ। এই নিয়ে কথা হয় নি আর কি। কাল ফোন করেছিল – বলল, স্নিগ্ধা খুব করে বলেছে তোমাকে নিয়ে যেতে। যাবে? যাবে তো?’

অঞ্জনের বাড়ি মফস্বলে – ওরা ট্রেনে গেল অনেকখানি, তারপর স্টেশনে নেমে রিকশা। ছিমছাম দোতলা বাড়ি, বাগান – সবুজ রং করা কাঠের গেটে লতিয়ে উঠেছে মাধবীলতা। রিকশা থামতেই দুজনে বেরিয়ে এসেছিল – অঞ্জনের টানটান মেদহীন চেহারা, তুলনায় স্নিগ্ধার মুখে খানিক ক্লান্তি আর বয়স। ওরা দোতলায় বসেছিল – চা, কাজু, ডালমুট – টুকটাকি কথা –

‘বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয় নি তো?’

– ‘সুন্দর সাজানো বাড়ি – দারুণ বাগান’

– ‘কতক্ষণ লাগল শিয়ালদা থেকে? ভীড় ছিল?’

– ‘ছুটির দিন তো – ফাঁকা ফাঁকা –’

– ‘রেড মিট খাওতো?’ এই সব...

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। পিয়ালী ভাবছিল হস্টেলের কথা জিগ্যেস করবে। জিগ্যেস করবে দীঘার কথা, অনিন্দ্যর ডুবে যাওয়ার কথা। তখনই অঞ্জন সামান্য হেসে – ‘তোমরা গল্প করো তবে’ বলে অনিন্দ্যর সঙ্গে নিচে নেমে গেল – সিগারেট সিগারেট খাবে হয়ত –

স্নিগ্ধা ঘুরে ঘুরে বাড়ি দেখাচ্ছিল পিয়ালীকে – স্নিগ্ধার পুজোর ঘর, বারান্দায় একটা দোলনা, ছাদের বাগান – টবে গন্ধরাজ, সূর্যমুখী, ছোটো জুই, লঙ্কা ফলেছে অজস্র, ছোটো টবে ঘৃত কুমারী, বুমকোলতা, ধনেপাতা –

আবার দোতলায় এসে বসেছিল ওরা। ‘টিভিটা চালাই? তুমি দেখো একটু – আমি রান্না শেষ করে নি? এই তো হয়েই গেছে।। ফ্রায়েড রাইসটা শুধু আর চপ গুলো ভাজব – আরে না না তুমি বোসো – এক্ষুণি হয়ে যাবে’ – পিয়ালীকে তুমি-ই বলছিল স্নিগ্ধা –

পিয়ালী একলাই বসে পর পর দুটো সিরিয়াল দেখল, তারপর খবর – গুচ্ছের বিজ্ঞাপনে মাথা ধরে যাচ্ছিল। স্নিগ্ধা সামান্য চোঁচিয়ে টুকটাকি কথা বলছিল। অনিন্দ্যরা নিচে গেছে অনেকক্ষণ। এবারে পিয়ালীর খিদে পাচ্ছিল। রাতও হয়েছে। কিচেন থেকে বেরিয়ে স্নিগ্ধা খাবার সাজাচ্ছিল – ফ্রায়েড রাইস, চাঁপ, পনীর, চাটনি, পায়েস সম্ভবতঃ – পিয়ালী বলল, ‘এবার ওদের ডাকা যাক। অনেক রাত হ’ল তো।’

স্নিগ্ধা ভাতের পাত্র টেবিলে রেখে শান্তভাবে বলল – ‘চলে আসবে’।

পিয়ালী সামান্য বিরক্ত হ’ল যেন – ‘এতক্ষণ হ’ল নিচে গেছে, কী করছে কি?’ স্নিগ্ধা আরও শান্তভাবে বলল – ‘নিচে নয়, মেজেনাইনে আছে – থাক না, চলে আসবে’।

পিয়ালী কোমরে আঁচল জড়িয়ে তরতরিয়ে নামল। মেজেনাইনের দরজা খোলা। দোতলার টিভির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে অন্য কোন আওয়াজ ঢুকছিল পিয়ালীর কানে – ল্যাভিঙয়ে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল পিয়ালী – অনিন্দ্য হাসছে – তুমুল হাসছে। মুখ বাড়িয়ে পিয়ালী দেখছিল, মেজেনাইনের পুরোটা জুড়ে পেপ্লোয় টেবিলটেনিস বোর্ড, তাতে পরিপাটি নেট – দেখছিল, ঘামে জবজবে অনিন্দ্য আর অঞ্জন – অনিন্দ্যর টপস্পিন ব্লক করছিল অঞ্জন – তারপরের ফ্লিপটা কে চপ করল,

পরক্ষণেই অঞ্জনের একটা লবকে স্ম্যাশ করে হেসে উঠল অনিন্দ্য। কালো টি শার্ট ঘামে ভিজে পিঠে স্টেটে গেছে, কপালের ওপর চুলের গুছি – সাদা বল ড্রপ খাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক, অনাবিল হাসছে অনিন্দ্য আর অঞ্জন – সমস্ত মেজেনাইন জুড়ে বল ড্রপ খাওয়ার আওয়াজ আর হা হা হাসি। অনিন্দ্যর মুখমন্ডল উদ্ভাসিত, সে হাসছে, চোঁচাচ্ছে, বাহবা দিচ্ছে অঞ্জনকে, কখনও নিজেকেই – দুই হাত আশ্চর্য মহিমময় ভঙ্গিতে কাছাকাছি এনে সার্ভ করছে – স্পিন করাচ্ছে – সামান্য সূচালো হয়ে যাচ্ছে মুখ তখন – কপালের কাটা দাগে ঘাম, তাতে আলো পড়ে তিলকের মত দেখাচ্ছে। এ কোন অনিন্দ্য? পিয়ালীর পা সরে না। বর্ম খুলে ফেললে অনিন্দ্য এইরকম সুন্দর? স্নিগ্ধা কখন যেন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ল্যান্ডিংয়ে। পিয়ালীকে আলতো টানল। বলল – ‘ওপরে এসো।’ পিয়ালী কথা বলল না, দ্রুত ভঙ্গি করে বলল – ‘কেন?’ স্নিগ্ধা আর পিয়ালীর মধ্যে সেই মুহূর্তে একটা বোঝাপড়া কাজ করছিল যেন – কেউ কথা বলছিল না – ঈশারা করছিল পরস্পরকে।

স্নিগ্ধা ঠোঁটে আঙুল রেখে ঈশারায় আবার বলল – ‘এসো।’

অবাক লাগল পিয়ালীর। এলো যদিও ওপরে। এসেই গলা তুলে বলল – ‘কেন ও ঘরে ঢুকলে কি হ’ত? আমরা দেখব না খেলা?’

- ‘যদি ওরা চাইত, আমরা দেখি – ডাকত। তাই না?’
- ‘হয়ত ভেবেছে, আমরা খেলা টেলা বুঝি না – ভালো লাগবে না, বোরড হ’ব –’
- ‘খেলুক না নিজেদের মত – এই সময়টুকুই তো –’
- ‘তুমি কিন্তু নিজে নিজে ভেবে নিচ্ছ’

পিয়ালীর চোখে চোখ রেখে ক্লান্ত হাসল স্নিগ্ধা – ‘না গো। জানি।’ ওর নখের কোণার, তর্জনীতে হলুদ লেগে ছিল, কপালে সামান্য স্বেদ। আঁচল নিয়ে মুখ মুছল স্নিগ্ধা।

- ‘জানো? কী ক’রে? অনিন্দ্য রেগুলার আসে এখানে? আসে? কবে থেকে?’
- ‘কেন তুমি জানো না?’

স্নিগ্ধা আর পিয়ালীর মাঝখানে এখন একটা বিশাল সবুজ টেবিল – ড্রপ খাচ্ছে সাদা বল – পিয়ালী লব করবে কি স্ম্যাশ – বুঝতে পারছিল না।



**ইন্দ্রানী দত্ত** – সিডনির বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্প লেখার তীব্র আকুতি টের পান। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, “আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অঙ্কের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ।” ইন্দ্রানী খুঁজে চলেছেন।

## অতীশ ব্যানার্জী

### বিধাতার ছুটি

নেপোর ওই এক বড় বাজে স্বভাব। শেষ পাতে এসে দই মেরে দিয়ে যায়। তাই আজকাল সবাই খুব সচেতন। দেশভক্তি দেখতে গেলে প্রমাণ চায় আর প্রেম দেখাতে গেলে ব্যাংক ব্যালেন্স জানতে চায়।

আজ বিকেল থেকে সবাই তেতে আছে বিশ্বর কাঁচা দেখার গল্প শুনবে বলে। আজ্ঞে, কাঁচা দেখা মানে ইয়ে বিশ্বেশ্বর সম্মাদার চাকরি পাবার পর তার বাবা মা দুজনে ঠিক করেছেন ছেলেকে লাগাম পরাতে ঘরে অবিলম্বে একজন সুশীলা বৌমা আমদানি করা ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু ব্যাপারটা শুনে প্রথমে একটু নিমরাজি হলেও পরে ঘিল্লী করার অভিপ্রায়ে হ্যাঁ বলেছে। তারপর Window Shopping শেষে আজ প্রথম Net practice হবে। প্রথম পাত্রীর গৃহে বিশ্বর অভিযান — মানে কাঁচা দেখা আর কি। যাই হোক, প্রথম দেখা সাক্ষাৎ, ক্যাবলা হাসি। বংশপরিচয় আর চা-পাতার পেডিগ্রী আলোচনার পরে প্রগতিশীল বাবা মারা তরুণ তরুনীকে অন্য ঘরে গিয়ে বড় হওয়ার আদেশ দিলেন। বিশ্ব থোড়াই জানতো অন্য ঘরে কি বাউন্সার অপেক্ষা করছে? লাজুক হেসে হবু বউ বললো — দেখুন আমার একটা Serious relationship ছিলো — কিন্তু এখন আর সে সব কিছু নেই। It's story of past but I rather be transparent তাই বলে দিলাম।

বেচারী বিশ্ব এর আগে প্রেম করা তো দূরের কথা বাসে ছাড়া কোন সদ্য পরিচিতার এত কাছে দাঁড়িয়েছে কিনা মনে করতে পারলো না।

কিন্তু প্রেস্টিজ পাঁচচার তো হতে দেওয়া যায় না। তাই সপ্রতিভ স্বরে বললো। সে আর এমন কি? এই নিয়ে তো আমার কবিতাও আছে।

গ্রীষ্ম শেষে বর্ষা আসে  
বর্ষণ শেষে প্রেম  
আমি যেদিন সাহেব হবো  
তুমি হবে মেম।

একটু অদ্ভুত স্তব্ধতা, আর তারপরে খিলখিলিয়ে হেসে বিশ্বর কাঁচা দেখার প্রথম শিকার ছুটে পালালো।

এ পর্যন্ত বলে কিন্তু আলতো চোখে নেপোর দিকে তাকিয়ে কাউন্টারের জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু নেপো গল্প ছাড়া বাকী পরিবেশটা উপেক্ষা করে বললো — কিন্তু তুই বিধাতার Employee আর Coin toss এর ব্যাপারটা জানিস?

নেপো সাধারণতঃ এইরকম প্রশ্ন করলে আমরা উত্তর দিই না বরং খুচরো আড্ডা থামিয়ে ওকে প্ল্যাটফর্ম ক্লিয়ার করে দিই। নেপো বলতে থাকলো — বিধাতা যাঁর হাতে অদৃষ্টের চাবি কাঠি, ভীষণ বোর হয়ে এক চ্যালাকে তাঁর কাজ বুঝিয়ে একটু দেশভ্রমণে বেরুলো। চ্যালার হাতে দিয়ে গেল একটা Coin. Coin toss -এর মাধ্যমে কর্মের গুণাগুণ নির্ধারিত হবে — ভালো কর্মে স্বর্গবাস আর মন্দকর্মে নরকবাস। তো বেচারী রোজ Coin toss করে, ফলাফল রোজ এক। তারপর একদিন Coin toss-এর রেজাল্ট পাল্টে গেলো — পৃথিবীতে এলো পাকা দেখা, বিবাহ, সংসারের অসারত্ব আর সেই থেকে রোজ অপেক্ষা করছি কবে আবার সব পাল্টাবে।

ভোরের আকাশে উঁকি দিয়েছে সূর্যমামা। নিমের দাঁতন আর এক ঘটি জল নিয়ে মাঠের দিকে আনমনে হাঁটতে শুরু করে। আজ সকাল থেকে মনটা কেমন যেন করছে। মনের মন বলছে কানে কানে ফিস ফিস করে আজ একটা অন্যরকম কিছু হবে।

অবশ্য এরকম আগে ও কয়েকবার মনে হয়েছে কিন্তু অন্যরকম কিছু হয়নি। গতানুগতিক একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি মাঝে মাঝে সন্দিহান করে তোলে সময়টা সত্যি এগোচ্ছে তো? ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে ওঠে। হাতের তালুর মধ্যে রাখা মন্ত্রপুতঃ মুদ্রাটা ঘামে ভিজে ওঠে। গুরুদেব দেহ রাখার আগে এই মুদ্রাটা যত্ন করে তার জিম্মায় রেখে গেছিলেন। গুরুদেবের আদেশানুসারে রোজ সকালে সে গুরুমন্ত্র জপ করে মুদ্রাটা টস্ করে। HEAD পড়লে সে ভগবান আর TAIL পড়লে সে শয়তান। গুরুদেব বলে গেছেন – প্রতিটি জীবের মধ্যেই ভগবান আর শয়তান মূর্তমান – পরিস্থিতি আর সময় একজনকে চালকের আসনে বসায় আর অন্যজনকে পিছনে। যে যখন গাড়ী চালায় তার মনমানি চলে কিন্তু পিছনে বসে থাকা অন্যজন সমানে চালককে বিরক্ত করে যায়। যদিও না গুরুদেব পঞ্চভূতের নতুন শরীর ধারণ করে এই মনিকাঞ্চনের মায়াকাননে আবার অবতীর্ণ হচ্ছে তদ্দিন এই গুরুদায়িত্ব তার পলকা কাঁধের ওপরে আরোপিত।

প্রথম প্রথম একটা মারাত্মক উত্তেজনা কাজ করতো। পরিসংখ্যান সূত্র অনুযায়ী HEAD অথবা TAIL পড়ার সম্ভাবনা ৫০/৫০। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়া অবধি ফলাফল একটাই হয়ে এসেছে। মুদ্রাটা যখন হাওয়াতে ওড়ে তার মনে আগে যেমন একটা চঞ্চলভাব কাজ করতো এখন আর তা হয় না। মনে হয় যেন, পূর্বনির্ধারিত যড়যন্ত্র অনুসারে ফলাফল একই রকম হতে থাকবে। কিন্তু সে বেশ বুঝতে পারছে এই একঘেয়েমির ক্লাস্তি কাটাতে একটা পরিবর্তন ভীষণ জরুরী। তার মনের মন বারবার বলছে আজকে হয়তো একটা অন্য কিছু হবে। হতেই হবে নতুবা সময়ের প্রবাহ মিথ্যা মনে হবে। আর সময়ের চাকা খেমে যায় তাহলে এত কষ্ট করে বানানো এই সাজানো বাগান মুহূর্তে শূন্যে লীন হয়ে যাবে। মহা কেলেক্সারি হবে।

বেশ কিছুদিন হলো অবিনাশ খুব আনন্দে আছে। সকালে ঘুম ভাঙলেই মনটা ফুরফুরে হয়ে ওঠে। আজকাল সব কিছু ভীষণ ভালো লাগে। যুক্তির নিক্রিতে ভর করে নয় যেন ভালোবাসার ডানায় ভর করে উড়তে উড়তে কেটে যায় দিনগুলো।

প্রথম যখন দেখা হয়েছিল তখন নিঃশব্দে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলো অবিনাশ সৃষ্টিকর্তাকে। নীরব বোবা প্রশংসা লজ্জায় লাল করে দিয়েছিলো ষোড়শী তনয়ার দুইগাল।

মাথা নত হয়ে গেছিলো। ভালবাসার আদ্রতায়। রাস্তার ধুলোতে লুটোপুটি খেতে খেতে অবিনাশের মনে হচ্ছিল সে যেন পৃথিবীর অধীশ্বর। দিগন্ত প্রসারী আশমানি আশকারা তার রাজপ্রাসাদের ছাদ আর যতদূর অবধি দৃষ্টি যায় ততদূর অবধি তার রাজ্য। তার রাজ্যের প্রজারা ভালোবাসার কাঙ্গাল। আর অবিনাশের হৃদয়ভরা এক আকাশ ভালোবাসা।

অবিনাশ মনে মনে শুধু একটাই প্রার্থনা করে। হে সৃষ্টিকর্তা, আগামী প্রতিটি দিন যেন একরকমের হয়। কোন পরিবর্তন যেন না আসে। সময় যেন খেমে যায়। সে যখন তার প্রেয়সীর হাত দুখানি ধরবে তখন যেন সময়ের ঘড়ি কোন মন্ত্রবলে অনন্তকালের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঐ মুহূর্তের যেন শুধু শুরু থাকে, শেষ নয়।

প্রাতঃকৃত্য সেরে, শুদ্ধাচারে গুরুমন্ত্র জপ করে মুদ্রাটা হাতে নিয়ে অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলো। HEAD মানে ভগবান যেখানে ভালোবাসার রাজত্ব আর TAIL মানে শয়তান যেখানে যুক্তিবোধের অধিপত্য। আজকে ও কি ভালোবাসা চালিকা শক্তি হবে আর যুক্তিকেই সওয়ারি। নাকি আজ সেইদিন যেদিন পরিসংখ্যান কলার উচিয়ে বলবে – “বুঝতে পেরেছো – গুরুদেব কতবড় দায়িত্ব সঁপে গেছেন তোমার মত এলেবেলের হাতে। জগৎ সংসারের কর্মের ধরণ নির্ধারিত হবে একটি টসের ফলাফলের উপর”।

হাসি পেল হঠাৎ – এতবড় দায়িত্ব কিন্তু গুরুদেবের কথা অনুযায়ী তার ফলাফলের উপর তার নিজের কোন অধিকার নেই। আজকাল কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে তার মনে হয় – একথা ভুল। সে যেন জানে ফলাফল কি হবে। Toss হবে HEAD পড়বে আর ভগবান মূর্ত হবে জীবের মধ্যে। সবাই অবলীলাক্রমে বুঝবে – জীবে প্রেম করে সেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। আর দেবী নয় – মাহেন্দ্রক্ষণের পূণ্য মুহূর্তে মুদ্রাটা ঘুরতে ঘুরতে আকাশে উড়লো। উড়তে উড়তে ক্লাস্ত হয়ে স্থির হয়ে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালো – তারপরে অহং স্রোতে আটকে থাকা বিস্ময়বিহীন মুখটার দিকে একটা মুচকি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হলো। ফলাফল?



অবিনাশ এখন বিবাহিত, পরিণতমনস্ক মানুষ সেদিনের সেই মৃদুভাষী ষোড়শী স্পষ্টভাবে জানিয়েছে – ভালোবাসার মানে শুধু গোপন গোপন খেলা নয় – ভালোবাসার একটা Maintenance Cost আছে। অবিনাশ যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখেছে কথাটার সত্যি ওজন আছে। তাই বোহেমিয়ান স্বপ্নবিলাসী নিজেকে Careerist বানানোর অদম্য চেষ্টায় নিয়োজিত করেছে।

যুক্তির যুক্তাক্ষরে সাদামাদা আটপৌরে ভালোবাসা ভালোবাসা Sentiment গুলোকে কেমন কেমন ক্যাবলা ক্যাবলা লাগে আজকাল সারাদিন তার নিজের কাছে নিজেকে আজকাল বেশ Matured মনে হয়।

শুধু সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, নতুন দিনের সূর্য ওঠার আগে সবার অলক্ষ্যে তার মনের মন ফিস ফিস করে বলে যায় – আজ হয়তো অন্যরকম কিছু একটা হবে। এই একইরকম গল্প কাঁহাতক একটানা চলতে পারে।

একটা অজানা অস্থিরতা কাজ করে ভেতরে। বিছানা ছেড়ে গভীর রাতে TV র পর্দায় চোখ রাখে – 14<sup>th</sup> February 2019 Pulwama Attack’’ জন্মু শ্রীনগর হাইওয়েতে জঙ্গিদের হামলায় চল্লিশজন CRPF জওয়ানের মৃত্যু। সংবাদ প্রচারকের অতি নাটকীয়তা আর একই News clipping পুনরাবৃত্তি দেখতে দেখতে চোখটা লেগে গেছিল।

ঘুমে ঢুলে পড়তে পড়তে হোঁচট খেয়ে তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেল! চোখটা রগড়ে দেখি সুখি উঠবো উঠবো করছে – আড়মোড়া ভাঙছে। TV তে সেই Video clips টা বার বার দেখিয়ে যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে TV টা বন্ধ করে দীর্ঘদিনের ভুলে যাওয়া অনাদৃত CD player টা চালাতেই একটা গান বেজে উঠলো –

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।

ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥

অস্ফুট মন আকাশে জগৎ সংসার ভাসে।

ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর ॥

– স্বামীজী (বাগেশী / আড়া চৌতাল)

অবিনাশের মন বলছে আজ অন্যরকম কিছু একটা হবে। আকাশটা আলো আলো হয়ে এসেছে। অবিনাশ বিছানার কাছে এলো পা টিপে টিপে। ঘুমন্ত বউয়ের মুখের দিকে মুচকি হেসে পাশে বসলো। তারপরে জড়িয়ে ধরে বললো – “Good Morning সোনা। Belated Happy Valentines Day.”



অতীশ ব্যানাজী একজন সাদামাটা বৈচিত্র্যবিশীন জীবনযোদ্ধার পোষাকী নাম। বর্তমানে শিকাগো প্রবাসী। আপাতত প্রাইভেট সেক্টরে কিছু অর্থহীন পাপড় ভাজছেন। শর্টে বলতে গেলে কলকাতার দই শিকাগোর বরফে জমে কুলফি। কিন্তু জুলফি ধরে টান দিলেই বোরোলিনের মতো কলকাতা, বন্ধুপ্রীতি, আড্ডা, সিনেমা, গল্প আর কবিতা প্রেম বেরিয়ে আসে। ভাল বাসেন বাজে বক্তে, খেতে আর খাওয়াতে। কোয়ালিটি মনস্কতা এবং তীব্র পাঠক প্রেমের দরুন কবি অতীশের কবিতার সংখ্যা অতি নগন্য। তাই তিনি পাঠক কুলের কাছে একজন ভয়ানক জনপ্রিয় কবি। নিন্দুকেরা বলেন অলস।

## দেবশ্রী মিত্র

### গুলাবচন্দ কিরানা স্টোর্স

ফ্ল্যাটবাড়ির নিচে একটাই ছোট দোকান, নাম গুলাবচন্দ কিরানা স্টোর্স। বাকি যা আছে তাকে দোকান বলা যায় না। এসি লাগানো ঝাঁ-চকচকে ইউনিসেক্স পার্কার, ছোট ট্রিলির সারি দেওয়া বিগ বাজার, কাফে, ফ্রন্ট ডেস্কওয়ালা ডেয়ারি, কোনোটাই ঠিক দোকান বলে মনে হয় না সত্যপ্রকাশবাবুর। তিনি মফস্বলের রিটায়ার্ড কেরানী, এইসব স্টোরের ভিড়ে তিনি হাঁফিয়ে ওঠেন। হাওয়াই চটি আর সাদা পাজামা শার্ট পরে তিনি ফুটপাথ ধরে হাঁটেন অতি ধীরে ধীরে, এই বাকঝাকে দোকানের ভিড়ে পা ফেলতেও কুষ্ঠা হয় তাঁর। এ কোথায় এসে পড়লাম, ভাবেন। এখানে আসার কোনো প্ল্যান ছিল না মোটেই। চল্লিশ বছরের সহধর্মিণী হঠাৎ করে চলে গেলেন তিন দিনের জুরে। অতবড় বাড়ি, বাগান, ছেলে বৌ কিছুতেই সেখানে একা থাকতে দিতে রাজি নয়। বাধ্য হয়ে তাদের সাথে আসতে হল এই বিদেশে। এখানে চাকরি করে রাজা আর মৌ। তারা ব্যস্ত মানুষ, বেরোয় সকাল আটটায়, ফেরে সেই রাত আটটায়। সকালে কুক আসে, রোঁধে দিয়ে যায় এদেশের মত বিশ্বাস ডাল, সবজি আর ডিমভাজা, সেসব তিনি নিজেই নিয়ে খান দুপুরে। বাবা আসায় একজন আধা দিনের মহিলাকে রেখেছে তারা। সে এসে বাসন টাসন ধোয়, বিকেল বেলা চা করে দেয় সত্যপ্রকাশ বাবুকে। তারপর তিনি একটু হাঁটতে বেরোন। বহুদিনের অভ্যাস, গিন্ধি থাকতে দুজনে মিলে যেতেন মোড়ের মাথায়, কিছুমিছু সংসারের জিনিস কিনে, কোনদিন ছেনোর চপ খেয়ে, কোনদিন বা নতুন লসিয়ার দোকান থেকে লসিয় খেয়ে, কোনদিন বা দুলালের জলভরা খেয়ে দুজনে বাড়ি ফিরতেন।

মাঝারি হাইটের মাঝারি গাত্রবর্ণের মাঝারি চেহারার ছাপোষা লোক সত্যবাবু। এত এসি দোকানের মাঝে বড় বেমানান। শীতের সময় দুটো টাটকা মুলো কিনবেন বলে বিগ বাজারের সামনে এসেছিলেন, টানাটানি করে ট্রিলি না খুলতে না পেরে ফিরে গেছেন গুলাবচন্দ কিরানা স্টোরের সামনে। এই দোকান আর তার মালিক দুজনেই বেশ পছন্দসই তাঁর। বুড়ো মালিক খুব যত্ন নিয়ে ডাকেন, বসতে দেন। “আইয়ে বাবুজি, বইঠিয়ে। ক্যায়া চাহিয়ে?” তিনি আগে মোটেই হিন্দি বলতে পারতেন না, আজকাল শিখেছেন খানিক। ভুল হিন্দিতে বলেন, কিছু নহি। দুঠা মুলো খরিদনে গয়া, পতা নহি ও ছোট গাড়ি কেইসে খোলতে হয়! গুলাবচন্দ ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে মুলো আনিতে দেন। পড়তে দেন হিন্দি কাগজ। হিন্দি প্রায় কিছুই পড়তে পারেন না সত্যবাবু, তবুও হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখেন। যতই হোক, লোকটা যত্ন করে দিয়েছে পড়তে। আলুর বস্তার ওপর বসে বসে সারাজীবন কেরানিগিরি করা ছাপোষা বাঙালি সত্যপ্রকাশবাবু মারওয়াড়ি গুলাবচন্দের দেশের গল্প শোনে আর প্লাস্টিকের ভাঁড়ে চা খান।

– দেশ ছাড়কে আয়ে থে বাবুজি, তো সবনে মানা কিয়া। বোলা, আপনা গাঁও আপনা হোতা হয়। পর ম্যায়নে সোচা, বাচ্চোকা লাইফ বানা দুঁ। দো বেটা, দোনো দুকান বানায়া। ব্যস, লাইফ সেট হয় উনকি। – মেরা বেটা ভি ইধার বড়া নোকরি করতা। ম্যায় ভি ইস লিয়ে আয়া। মেরা ভি গাঁও মে বড়া ঘর, বাগান হয়। – মন করতা হয় আভি চলা যাউ। পর বাচ্চো কে খাতির...

এইভাবে কথা টথা হয়। অর্ধেক বাংলা, অর্ধেক ঠেঁট হিন্দি, মাড়ওয়ারি। সমস্যার কথাবার্তা বলা যায় এই অসম মনের প্রায় সমবয়স্ক জনকে। তাঁরা কথা বলেন, গুলাবচন্দের ছেলে তার দোকান চালায়। বাপে তার ভুল ধরে, চারটে ধমক দেয়। তারপর বলে, আজকালকে বাচ্চোকো তমিজ নহি হয়। চারবার বোলো, তব যাকে শুনতে হয়। এইটা সত্যবাবুও মনে মনে আওড়ান। ছেলে বৌ মন্দ না তার, তবু কোন কথাটা শোনে! এই যে বললেন অঘ্রাণ মাসে বড়ির বিয়ে দেওয়ার নিয়ম, অনুপূর্ণা বরাবর দিত, ছাদে বসে পরিস্কার সাদা কাপড়ে ধান দুব্বো সিঁদুর হলুদ দিয়ে বুড়ো বুড়ি বড়ির বিয়ে দিয়ে

বচ্ছরকারের বড়ি দেওয়া শুরু করত, তোরা নাহয় নিয়মরক্ষায় দু চারটি দে। বারান্দায় রোদে শুকোতে দিলে আমিই বসে পাহারা দেব। ছেলে বলল, বাবা, আজকাল অনলাইনে সব পাওয়া যায়। আনিয়ে দিচ্ছি। তুমি সারা দুপুর রোদে বসে থাকলে অসুখ করবে তো! বড়ি এল, আর ঝোলও রান্না হল রবিবার। কিন্তু সত্যবাবুর সেই ডাল ফেটানোর সুঘ্রাণ আর পাওয়া হল না। কাকে বলেন! গুলাবচন্দকেই বলেন। বড়ি শুনে সে বউকে দিয়ে মারাঠি কচুপাতার বড়া বানিয়ে এনে খাওয়ায় তাকে। রামোঃ, এই নাকি বড়ি! যাক, তবু তো মনে করে বানিয়ে এনেছে। এই বা করছে কে এখানে? মনটা বেশ খুশি হয়ে যায় তাঁর। মনে ভাবেন, কাল দু'চারটে ভাজা বড়ি নিয়ে আসবেন বিকেলে আসার সময়। চা দিয়ে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে।

কিন্তু সে খবর ছেলে বউয়ের কানে উঠবে না, এ হয় কখনো? কাজের বউটাই বলেছে নিশ্চয়ই যে বাবা কাগজে বড়ি মুড়ে নিয়ে গেছিল নিচে! ছেলে বলে, বাবা, তুমি ওনার দোকানে অমন বসে থাকো কেন? ওনাদের তো বেচাকেনার অসুবিধা হয়! তুমি পার্কে হাঁটতে যাও না কেন বরং। সবাই আসেন তোমার বয়সী। হ্যাঁ, ওইটাই বাকি আছে। পার্কে যারা আসে, সবাই ঝাঁ চকচকে শার্ট প্যান্ট পরে বসে বসে ইংরেজিতে গল্প করে, কার কটা ফ্ল্যাট আর নয়তো ট্র্যাকসুট পরে জগিং করে। তাদের সাথে কী কথা বলবেন শুনি! গুলাবচন্দ বরং লোক ভাল, বলে, বাবুজি ঘর আইয়ে একদিন। মেরি বিবি বড়িয়া দাল বাটি বানাতি হয়। খিলায়েংগে আপকো। ছেলে বউ রাগ করে সে গুলাবচন্দের সাথে দূরের সেলুনে চুল কাটাতে যায় বলে। দুশো টাকা দিয়ে এই এসি সেলুনে চুল ছাঁটায় কে শুনি? গুলাবচন্দের বড় গুপ্তি, কেউ মরলেই বাপ ছেলে সব ন্যাড়া হওয়ার নিয়ম। তারা বছরে চারবার ন্যাড়া হয়, সত্যবাবুও তাদের সাথে গিয়ে চুল কাটিয়ে আসেন। বিশ টাকা নেয়, মাসাজ করে দেয় ঘাড় মাথা দেশের মত। চুল কাটিয়েও শান্তি। বলুক গে যাক ছেলে!

একদিন হঠাৎ দেখা যায় গুলাবচন্দের দোকান বন্ধ। তার পর দিনও, আর পরের দিনও। এক হপ্তা বাদে ছেলে দোকান খোলে, খোঁজ নিতে গেলে বলে, বাবুজির হার্ট এটাক হল, অর্ধেকটা পড়ে গেছে আঙ্কেলজি। ঘরে আছে, এমনি ভালোই আছে এখন। যাবেন একদিন, দেখে আসবেন। সে আর যাওয়া হয় না সত্যবাবুর, একে তো একা একা বড় রাস্তা পেরোতে ভয় করে তাঁর আজকাল, তারপর কুষ্ঠাও হয় খানিক। কী জানি যদি বাড়ির লোকেরা কিছু মনে করে! খোঁজ টোজ নেন তার ছেলের কাছে রোজ, বাবুজি উঠে বসতে পারে বাবা? খায় দায় তো ঠিকমতন? ছেলে দায়সারা জবাব দেয়, এসব উটকো ঝামেলা বিক্রি-বাটার সময় এন্টারটেইন করা ভারি শক্ত! তবুও রোজ জিঙ্গেস করেন তিনি, হাজার হোক চেনা লোক!

মাসখানেক বাদে গুলাবচন্দ কিরানা স্টোর্স ভাঙার কাজ শুরু হয়। ছেলে এই পুরোনো মাস্কাতা আমলের দোকান তুলে ঝাঁ-চকচকে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বানাবে। এসব দোকানে আজকাল আসছে কে? বাপটা পুরনো দিনের লোক, এসব বোঝে না। সে আর ভাইয়া মিলে নতুন করে বানাবে বেওসা। সেদিন বাইরে এসে দোকান ভাঙা হতে দেখে সত্যবাবুর মুখ শুকিয়ে যায়, এইসব আজকাল ছেলেছোকরাদের রকম দেখো, বাপ বিছানায় পড়তে যা দেরি, বাপের চিহ্ন অবধি রাখবে না এরা!

তিনি আজ সাহস করে গাড়ি ভর্তি বড় রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। আজ যেতেই হবে গুলাবচন্দের কাছে। খবরটা দিতেই হবে তাঁকে। বড় হাইরাইজ আর ঝাঁ-চকচকে সুপারমার্কেটের সামনে হাওয়াই চটি পায়ে সাদা পাজামা শার্ট পরিহত এক সাদা মাথার বৃদ্ধ ডাইনে বাঁয়ে হাত দেখিয়ে গাড়ি থামানোর বৃথা চেষ্টা করতে থাকেন।

---

**দেবশ্রী মিত্র** – স্কুল মফঃস্বলে, কলেজ কলকাতায়। প্রায় দুই দশক কলকাতার বাইরে বিভিন্ন শহরে। দিল্লি, পুণে, মুম্বই। বিবাহসূত্রে তামিল-ঘরণী। অন্তত দীর্ঘ দশ বছর বাংলা বলেন নি কারোর সাথে। নেশা – বই পড়া, বেড়ানো, রান্না। পেশায় আগে ছিলেন টেলিকম এঞ্জিনিয়ার। আজকাল স্যাভাটিকাল নিয়েছেন – জীবন আরো খানিক ছেনে নিয়ে বেঁচে নিতে চান বলে। স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। স্বপ্ন দেখাতে চান।

---

## মঞ্জিষ্ঠা রায় পাহাড়ী আতঙ্ক

নৈনিতাল থেকে ৬ ঘণ্টার দূরত্বে পাতাল ভুবনেশ্বর মন্দির। মন্দির বলতে তেমন যদিও কিছু নেই, পদতল থেকে প্রায় ৩০ মিটার গভীরে একটি সুদীর্ঘ গুহা। নিচে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, এ গুহা নাকি স্বয়ং মহাদেবের তৈরী। তবে গুহায় অক্সিজেনের অভাব তাই বয়স্ক বা শারীরিক সমস্যা থাকলে মন্দিরে যেতে দেয়া হয় না। তাই আমরা এই গুহা পথে পাতালে নেমে শিবলিঙ্গ দর্শন করে এলেও বাবা মা যেতে পারলেন না। মন্দিরের বাইরে অপেক্ষা করলেন। এই অবধি তো সব ঠিক ছিল। কিন্তু এর পরে যে ঘটনা ঘটলো তার উত্তর আজও খুঁজে পাই নি। এ ঘটনা বাড়ি ফিরে অনেক কে বলেছি কিন্তু অনেকের মনে হয়েছে এ নিছক বানানো গল্প, কিন্তু এ পৃথিবীতে অনেক সময় অনেক কিছু ঘটে যার কোনো কারণ বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয় না।

মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখলাম বিকেল হয়ে গেছে। গুহা পথ, দর্শন, পূজা দিতে অনেকটাই সময় লেগে গিয়েছিল। একটু এগিয়ে ছোট ছোট চা এর দোকান। চা বিস্কুট খেয়ে সকলে মিলে গাড়িতে উঠে বসলাম। মা ঠিক ড্রাইভার এর পিছনের সিটে, বাবা মাঝখানে আর আমি বাম দিকের জানলার ধারে, আমার কোলে আমার ৩ বছরের ছেলে আর আমার বর সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে। পাহাড়ে কেমন ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে যায়। সূর্য ডোবার সাথে সাথেই কেমন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এদিকের রাস্তায় গাড়ি একেবারেই নেই। তবু পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ, ধরে সুদীর্ঘ খাদ আর গোপুলি আলোয় খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছেন আমাদের গাড়োয়ালী ড্রাইভার। গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তা দেখতে দেখতে চলেছি। আকাশ এখন নীলচে বেগুনী, দূরের পাহাড় গুলোও সেই রং গায়ে মেখেছে। চারিপাশ যেন থমথম করছে, কান্না পাওয়ার ঠিক আগে যেমন একটা কষ্ট গ্রাস করে এ পাহাড়ের যেন তেমন একটা চাপা কষ্ট, গভীর গুমোট পাহাড়।

এঁকে বঁকে গাড়ি ছুটে চলেছে। একমনে বাম দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তা দেখছি, হঠাৎ চমকে উঠলাম বাবার আর্তনাদে,

“ওটা কি ওওও কে !!! কিরে ওটা কি !!!” কাঁপা ভয়াত গলায় চৈচিয়ে উঠেছেন বাবা।

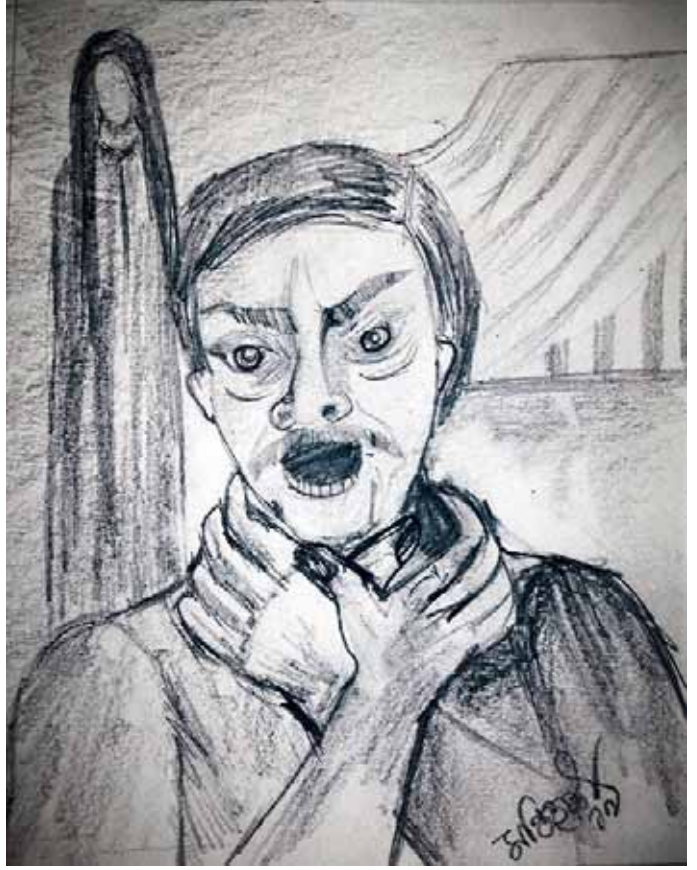
কিন্তু কি আশ্চর্য ওই একই দিকে আমিও তাকিয়ে আছি কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

বাবা ঠিক কী দেখে এতটা ভয় পেয়ে গেলেন? কিছু বুঝতে পারছি না। বাবা আবার বলে উঠলেন, “চোখ জ্বলছে, ওটা কি, ওটা কে ??” কিছুক্ষণ ও ভাবে চিৎকার করার পর বাবা একদম স্থির হয়ে গেলেন বাবাকে জিজ্ঞাসা করে চলেছি “কি দেখেছো, কাকে দেখলে বলো”, কিন্তু কোনো উত্তর নেই। একবার ভাবলাম যে বাবা কি মজা করছেন? কিন্তু এভাবে মজা করার মানুষতো তিনি না। আমরা সকলেই খুব বিচলিত হয়ে উঠেছি দেখে আমাদের ড্রাইভার বললেন, পাহাড়ি পথে নাকি অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়, আমরা যেন অহেতুক চিন্তা না করি। বাবা কেও বোঝালাম হয়তো আলো আঁধারীতে কোনো শুকনো গাছ দেখেছো, না হয় অন্য কিছু দেখেছো, মিথ্যে ভয় পেও না। দেখলাম বাবা কোনো কথার কোনো উত্তরই দিচ্ছেন না।

কিছুক্ষণ পর বিনসর এ আমাদের রিসোর্ট এ পৌঁছলাম। পাহাড়ের ঠিক কোলে ছোট্ট কাঠের দোতলা ঘর। নিচের তলার ঘর মা বাবার আর কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই আমাদের ঘর। বাবা মা কে ওদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা ওপর ঘরে এসে ফ্রেশ হয়ে নিলাম।



সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত ঘনিয়ে আসছে, এ রিসোর্ট একদম সুনসান। আমরা ব্যতীত আর কাউকে দেখছি না। রিসোর্টটি একটু আলাদা। লাগোয়া ফার্মে বিভিন্ন রকম শাগ সজী, ভেষজ গাছ চাষ হয়। চাষের জিনিসই রান্না করে গেস্ট-দের খাওয়ানো হয় হয়। যারা সব কিছু দেখা শোনা করেন সকলে এ গ্রামের মানুষ। শহরের জটিলতা নেই সরল, সদাহাস্য মানুষগুলি সাহায্যের জন্য শশব্যস্ত। সকালে বেড়াতে যাবার আগেই এদের রাতের মেনু বলে যেতে হয়েছিল। সকালেই গাছের একটি আস্ত কচি কুমড়ো নিয়ে এসে দেখিয়ে এটিকে ডিনারে রান্নার অনুমতি নিয়ে গিয়েছিলেন এ রিসোর্টের এক জন কর্মী।



রাত প্রায় ৯ টা বেজেছে। বাইরে বেশ ঠান্ডা। হু হু করে ঠান্ডা হওয়া বইছে। আকাশে টিমটিমে তারা আর দূরে পাহাড়ের গায়ে গ্রামে ছোট ছোট আলো জ্বলছে। ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গেলেই ডাইনিং হল। ছেলে কে কোলে নিয়ে মা বাবা কে খাবার জন্য ডাকতে গেলাম। মা দরজা খুলে দিলেন। দরজার খুলতেই আমার ছেলের কান্না শুরু হলো। এতক্ষণ তো ঠিকই ছিল। মার কাছে অবধি ছেলে গেল না। আমার কাঁধে মুখ গুঁজে আমাকে জড়িয়ে কেঁদে চললো।

খাটের এক কোনে বাবা শুয়ে আছেন। গায়ে কেবল একটি গেঞ্জি ও বারমুডা। রাতে তাপমাত্রা যেখানে ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আমাদের গায়ে সোয়েটার, জ্যাকেট চাপানো, সেখানে বাবা গরমকালের পোশাকে শুয়ে রয়েছেন। মা কে বললাম, “একি, কম্বল খুঁজে পাওনি? বাবা এভাবে শুয়ে আছে ঠান্ডা লেগে যাবে তো!” মা বললেন, বাবার গায়ে কম্বল চাপালে বাবা কম্বল বার বার গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। অথচ বাবা কত শীতকাতুরে সেটা আমি জানি। তাহলে কি বি.পি টা বেড়ে গেল, নাকি অন্য কোনো শরীরের সমস্যা? ব্যাপারগুলো ভারী অদ্ভুত। ঘরের ভিতর একটা অদ্ভুত আঁশটে গন্ধ ছাড়া। কই আমাদের ওপরের ঘরটি তে তো এমন গন্ধ ছাড়া নেই। কোনো কিছুর উত্তর পাচ্ছি না কেন? সব কিছু এত অদ্ভুত লাগছে কেন?

বাবা রাতে কিছুই খেলেন না। সেভাবেই ঘরে বিছানার এক কোনে শুয়ে রইলেন। মায়ের ও আমাদের চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে। মানুষটাকে কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। যেন অচেনা এক মানুষ। আমরা রাতে অল্প কিছু খেয়ে চিন্তা নিয়েই শুতে গেলাম। মা কে বার বার বললাম যে কোনো সমস্যা হলে আমাদের ডাকবে আমরা তো ওপর তলাতেই রয়েছি। সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে, বিছানায় শুতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুমটা ভাঙল কারো একটা চিৎকারে! সে কি বীভৎস চিৎকার। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গেলাম মা বাবার ঘরে। সে যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম সে এ জীবনে ভোলার নয়। বাবা তার নিজের দুহাতে নিজের গলা সজোরে টিপে ধরেছেন। রক্তবর্ণ চোখ, গলায় চাপ পড়ায় জিভটা বীভৎস ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত আত্ননাদ করে চলেছেন, কিন্তু কণ্ঠ আমার বাবার না, এ যেন কোনো নারী কণ্ঠ।

কিছু বুঝতে পারছি না। আমরা কেউ কাছেও যেতে পারছি না এত তেজ মানুষটার। যত সময় যাচ্ছে বাবার শরীর কেমন যেন নীল হয়ে যাচ্ছে। আত্ননাদ নিরুপ পাহাড়ের নিস্তব্ধতা গ্রাস করছে। এদিকে বাবার এই অবস্থা দেখে মা কান্না

শুরু করে দিয়েছেন, এখন রাত ৩টে। মা কিছুক্ষণ আগেই রিসর্টের কর্মীদের ডাক্তারের ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। তারা আশ্রয় চেষ্টা করেছে। তবে তাদের হাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে এ ঘটনা যেন তাদের কাছে নতুন না। তারা আমাদের বার বার বাবার কাছে যেতে বারণ করেছে। আমরা হতভম্বের মতো ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আর বাবা ঘরের মধ্যে এক কোণে দাঁড়িয়ে। রক্তবর্ণ চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তবে যত সময় যাচ্ছে আতর্জনাদ গোঙানিতে পরিণত হচ্ছে।

কয়েক মিনিট পর এক দীর্ঘকায় মানুষ এলেন। মাথায় টুপি, গায়ে সোয়েটার, কাঁধে একটি ঝোলা। ইনিই কি ডাক্তারবাবু? পাহাড়ের গ্রামের ডাক্তাররা কি এরকম ঝোলা কাঁধে নেয়? দেখে তো ডাক্তার মনে হয় না। তবু মনে একটু জোর পাওয়া গেলো, বাবার এবার চিকিৎসা হবে তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি ঘরে পা দিতেই বাবার গোঙানি আবার আতর্জনাদের রূপ নিলো। ডাক্তারকে দেখে বাবা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? লোকটি ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে গিয়ে একটি জানালা খুলে দিলেন। বাইরে হু হু করে হিমেল হওয়া বইছে। বাবা আরও জোরে নিজের গলা টিপে ধরছে। এইবার লোকটি তার ব্যাগ থেকে কি সব জিনিস বার করলো আর এক মুঠো ছাই ছুড়ে দিলো বাবার দিকে, পর পর তিনবার। বিকট শব্দ করে জানালাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠলো এবার। ঘর থেকে যেন একরাশ হাওয়া বাইরে বেরিয়ে গেল। দীর্ঘকায় লোকটি ক্রমাগত মন্ত্র পড়ে চলেছে। দেখলাম বাবার শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। হাত দুটো আলাগা হয়ে এসেছে। গলাতে দশটা আঙুলের গভীর লালচে দাগ। লোকটি বাবার মাথায় গায়ে ছাই মাখিয়ে দিলো। আমরা এবার ছুটে বাবার চোখে মুখে জল ছিটাতে লাগলাম। লোকটি গম্ভীর গলায় বললেন, “অব সব ঠিক হ্যে, কাল সুবহা ইনকো শিব জি কা দর্শন করওয়ানা”। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমার তখন বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ পর বাবা অনেকটা সুস্থ। বাবা বললেন গতকাল সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো দেখার পর থেকে আর কোনো ঘটনাই তার মনে নেই। পরে জানলাম এ পাহাড়ে প্রায়শই এ রকম ঘটনা ঘটে। গ্রামের মানুষ অনেক সময় পা পিছলে পাহাড়ের খাদে পড়ে প্রাণ হারায়। খাদে পড়ে যাওয়া মানুষ গুলোর দেহ পাওয়া যায় না, সৎকারও হয় না, তাই তারা অশরীরী রূপে ঘুরে বেড়ায় ও জীবন্ত মানুষের দেহে কজা করে। আর যে লোকটিকে ডাক্তার ভাবছিলাম উনি আসলে এখানকার গ্রামের ওঝা। রিসোর্টের লোকেরা বাবার অবস্থা বুঝে ওঝা ডাকতে ছুটেছিলো।

এই ঘটনায় কোনো যুক্তি বা ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। তবে এটি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। সেদিনকার ওই পাহাড়ি মানুষগুলোর উপকার আমরা কোনোদিন ভুলবো না। পরদিন সকালেই আমার শিব মন্দিরে পূজো দিলাম। বাবা তখন সম্পূর্ণ সুস্থ।



আমি মঞ্জিষ্ঠা, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় থাকি, ছবি আঁকতে, গল্পের বই পড়তে ভালোবাসি, পাহাড় খুব প্রিয়। বিশেষ করে হিমালয়। আর পাঁচটা মেয়ের মতই খুব সাধারণ এক মেয়ে। সহজ ভাবে জীবনটাকে দেখতে ভালোবাসি। পুরোনো দিনের মানুষ গুলোর মুখে পুরোনো দিনের গল্প শোনা, হারিয়ে যাওয়া পুরোনো বাঙালী রান্না বামা শিখতেও খুব ভালোবাসি।

## তপনজ্যোতি মিত্র

### অমৃতের সন্তানসন্ততি

আকাশের রঙ কী নীল ছিল ? – নীল ছিল

গাছের পাতা আর ঘাসেদের রঙ কি সবুজ ছিল ? – সবুজ ছিল

সূর্যের রোদ্দুরের রঙ কী সোনা ছিল ? – সোনা ছিল

ক্ষেত ছিল শস্যময় ? – হ্যাঁ, ছিল শস্যময়

দিগন্তের থেকে কি বয়ে আসত হাওয়া ? – হ্যাঁ, গভীর শীতল হাওয়া

সারা পৃথিবী জুড়ে অজস্র ফুল কি ফুটত ? – ফুল ফুটত

তুমি এই বন্ধ ঘরের কাঁচের ছোট জানালা দিয়ে দূরে কি দেখো বাবা ?

দেখি আবার কবে সূর্যের মুখ দেখা যাবে, কবে দেখা যাবে নীলাঞ্জন নীলাকাশ, দেখা যাবে সবুজ প্রান্তর, কখন আবার ঘরের বাইরে খেলবে অমল শিশুরা ।

আবার কবে হবে সেসব বাবা ?

হয়ত কয়েক হাজার বছর পর ।

মা'র কি হয়েছিল বাবা ?

বিস্ফোরণের সময় তিনি বাইরে কাজে ছিলেন, তিনি ধূলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন ।

এত কষ্ট সয়ে তুমি কি করে থাক বাবা ?

তোমার কথা ভেবে, তোমাদের সকলের কথা ভেবে মা ।

এত উন্নত হয়েও কেন আমরা, মানুষেরা নিজেদের এইভাবে ধ্বংস করি বাবা ?

বড় কঠিন প্রশ্ন, হয়ত এক দিন আমরা মনের দিক থেকে আরো উন্নততর হবো ।

আমি যে কিছু দেখতে পাই না বাবা, কেন আমার এরকম হল ?

তুমি অল্প সময়ের জন্যে হলেও একদিন এই ঘরের বাইরে গেছিলে, তখনই তেজস্ক্রিয়তা তোমাকে গ্রাস করে মা ।

হ্যাঁ বাবা, আমি যে এই বন্ধ বাংকারের ঘরে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, তাই একটু বাইরের পৃথিবীতে ছুটে গেছিলাম । আমি কি আর চোখে দেখতে পাব না বাবা ?

নিশ্চয় তুমি পাবে মা, তুমি আমার চোখ দিয়ে দেখবে।

তুমি আমার চোখ পাবে, আমার শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাবে, ডাক্তারকাকু তার ব্যবস্থা করছেন।

না, না, তা কিছুতেই হয় না, কিছুতেই হয় না, তোমাকে ছেড়ে আমি কি করে বাঁচবো বাবা ?

তোমাকে বাঁচতেই হবে মা, তুমি বড় হবে, তোমার সন্তান সন্ততি হবে, তাদের সন্তান সন্ততি হবে, এইভাবে বয়ে চলবে সেই অমৃত জীবন।

আবার কি একদিন আকাশ গাঢ় নীল হবে বাবা? - হ্যাঁ, নীল হবে

আবার কি গাছের পাতা আর ঘাসের রঙ সবুজ হবে? - সবুজ হবে

আবার কি সূর্যের রঙ সোনা হবে? - সোনা হবে

ক্ষেত হবে শস্যময়? - শস্যময় হাওয়া বইবে? - বইবে

অজস্র ফুল ফুটবে? - ফুটবে

পাখিরা ডাকবে? - ডাকবে

গানে গানে ভরে যাবে আমাদের এই অপূর্ব সুন্দর পৃথিবী? - ভরে যাবে

অমৃতের সন্তানসন্ততির বাঁচে থাকবে? - বাঁচে থাকবে



**তপনজ্যোতি মিত্র** - সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু-এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। একটি গল্প 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি' দখিনা পত্রিকায় প্রকাশিত। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্প করতে ভালবাসেন। এবং কখনো নাটকে অভিনয়, কখনো বা দেশ ভ্রমণ।

## তিতাস মাহমুদ

### ভাষা দিবস

হাসপাতাল শেষে বাড়ি ফিরলাম। ছোট ছেলে যুবায়ের অনলাইনে কোরান পড়া শিখছে। ওর শিক্ষক উর্দুভাষী তবে স্কাইপে ওদের কথাবার্তা হয় ইরেজিতেই। আমার স্ত্রী শায়লা চৌধুরী শীতের কম্বল মুড়ি দিয়ে টিভিতে অরজিৎ সিং এর গান শুনছেন। কিছুদিন বাদে আমাদের পাশের শহরে ওঁর এক বিশাল অনুষ্ঠান হবে; আমরা সেখানে যাবো। বড় ছেলের পড়াশুনার খবর জানতে ওকে হোস্টেলে ফোন করলাম। ও ফোন ধরলো না। ছোট্ট একটা SMS এ জানালো, “বাবা, টুমরো আই হেভ এ্যা বিগ এক্সাম; উইল টক টু ইয়ু লেটার।”

জীবনের প্রয়োজনে এভাবে একই ছাদের নিচে আমরা প্রত্যেকেই নানান ভাষায় একে অপরের সাথে কথা বলি। এরপরেও আমরা যে যার মতো নিজস্ব ছোট একটা পৃথিবী নির্মাণ করি। একজন মানুষ বহির্জগতে অন্যের সাথে যতটা কথা বলে, আসলে নিজস্ব পৃথিবীতে নিজের সাথে নিজেই সে কথা বলে ঢের বেশি। আমি বৈঠকখানায় টেলিভিশন ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বসে রইলাম।

টিভিতে কী অনুষ্ঠান হচ্ছে তাতে আমার এতটুকু মন নেই। আমার চোখে শুধু মারভিনের চেহারা ভেসে উঠছে। আজকে চেয়ারে একটা হুইল চেয়ারে বসে, ডানদিকে ঢলে পড়তে পড়তে, মারভিন আমাকে দেখাতে এসেছিলো। ওর মুখের বাম পাশ দিয়ে অনর্গল লালা বারছে, কোন কথা বলতে গেলেই ওর শব্দ, বাক্য সব জড়িয়ে যাচ্ছে। মারভিন বেশ পন্ডিত গোছের মানুষ ছিলো। মাত্র কিছুদিন আগেও শক্ত, সবল পঞ্চাশোর্ধ এই যুবকটি আমার সাথে তাবৎ বিশ্ব নিয়ে বেশ উঁচু গলায় তুমুল বিতর্ক করে গেছে। আজ আমি মানতেই পারছি না, বলা নাই, কওয়া নাই একটি কুৎসিত “ব্রেন স্ট্রোক” এক লহমায় ওর মুখের ভাষা এভাবে কেড়ে নেবে। বোবা মারভিন আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে ছিল। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, অদৃশ্য নিয়তির প্রতি ওর ভেতর কী অসম্ভব ক্ষোভ, অভিমান আর অভিযোগ! সে চিৎকার করে তাবৎ অসহায়ত্ব আর অপমানের কথা বলতে চাইছে, কিন্তু ওর মুখে কোন ভাষা নাই।

আমরা কণ্ঠনালী, ঠোঁট, জিহ্বা নাড়িয়ে আরবী, ইংরেজি, জার্মান, ফ্রান্স, হিন্দি, বাংলা, স্প্যানিশ যে ভাষাতেই কথা বলি না কেন, পৃথিবীতে বিভিন্ন কারণে মানুষ তার মাতৃভাষা হারায়। এ সময় তার বুকের ভেতর প্রচণ্ড ক্ষোভ, আগুন, দ্রোহ এবং দাহ জমতে থাকে। অবশেষে মৌনতাই হয় তার একমাত্র মাতৃভাষা; তবে কখনো কখনো এই নীরবতার শক্তি ভিসুভিয়াসের চাইতেও প্রবল হয়, যেমন ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে মাতৃভাষা ফিরে পাবার জন্যে এক বিশাল অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল।

মানুষের মুখে অব্যক্ত দুঃখ, কষ্ট, অভিযোগ আর অভিমানের নীরবতা নয়, তার সুমিষ্ট মাতৃভাষা কল্ কল্ করুক। সবাইকে শহিদ দিবসের শুভেচ্ছা জানাই।



**তিতাস মাহমুদ :** অনেকে বলেন তিতাস মাহমুদ পথ ভুলে ডাক্তারি পেশায় জড়িয়ে গেছেন। চিকিৎসক না হয়ে তিনি যদি সাহিত্যিক হয়ে লেখালেখি করতেন জীবনে তিনি অনেক বড় হতেন। এর উত্তরে তিতাস মাহমুদ বলেন, এ জীবনে কিছুই হওয়া হয়নি আমার। কবিতার প্রতি অসম্ভব দুর্বলতা তার। কবিতা মানে এক মুঠো মুক্ত বাতাস, অপার প্রশান্তি। ইদানিং ফেসবুকে তার আবৃত্তির একটি ছোট অনুরাগী মহল তৈরী হয়েছে।



## অর্পিতা চ্যাটার্জী

### অসমাপ্ত শত্রুতা

যাক আর কোনো ভয় নেই। ঘাড়ের বাঁ দিকের ছোট টিউমারটার সার্জিকাল রিমুভালের পর ডাক্তার তাইই বলেছিলেন অ্যাটর্নি মার্ক গরম্যানকে। মেলানোমা, বিশ্রী ধরণের স্কিন ক্যান্সার ছিল গরম্যানের। এরপর কেটে গেছে কোনো ঘটনাহীন আটটা বছর। ১৯৯৮ সাল। রুটিন ডাক্তারি চেক আপ এ গেছেন গরম্যান। পরীক্ষার পর ডাক্তারবাবুর দ্রুত রীতিমত কুঁচকে উঠল। জিজ্ঞাসাই করে বসলেন, কি ব্যাপার মিস্টার গরম্যান, আপনার কি হঠাৎ পানাসক্তি ভীষণ বেড়ে গেল নাকি? পুরোনো মেলানোমা টিউমারটি বিশ্রী ভাবে তার রাজ্য বিস্তার করেছে গরম্যানের লিভারে। আশেপাশের অন্য অঙ্গেও ছড়ানোর চেষ্টা করছে। সাংঘাতিক প্রাণঘাতী এই মেলানোমা। ছড়িয়ে পড়লে, রোগ ধরাপড়ার ছয় থেকে দশ মাসের বেশি সময় দেয় না যুববার। গরম্যানের তখন সবে উনপঞ্চাশ। কেমন শান্ত হয়ে গেলেন গরম্যান। পৃথিবীর রূপ রস এত সীমিত ছিল তাঁর জন্য?

বোনের কাছ থেকে খবর পেলেন হঠাৎ, কলোরাডোর কোন এক হাসপাতাল নাকি মেলানোমার চিকিৎসায় চলতি কেমোথেরাপির সাথে নতুন কি এক ওষুধ ব্যবহার করছে নাম ইন্টারলিউকিন-২, ডাকনাম-আইএল-২। ডুবন্ত মানুষের কুটোও ভরষা। পত্রপাঠ গোরম্যান মেরিল্যান্ড থেকে কলোরাডোর টিকিট কাটলেন। গোরম্যান যতক্ষণে কলরাডো পৌঁছবেন ততক্ষণে চট করে আমরা অন্য একটা গল্প একটু শুনে নিই কেমন? গল্পটা আইএল-২ এর।

আমাদের শরীরের অসংখ্য ধরণের প্রোটিন থাকে। তাদের প্রত্যেকের জন্য নানান রকম নির্দিষ্ট ধরণের কাজ রয়েছে। আর তার ফলেই আমি, আপনি বা গরম্যান সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে চলে ফিরে বেড়াতে পারি। আর তার ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ পরিমাণ এদিক ওদিক হলেই গন্ডগোল। হ্যাঁ এতটাই নিয়ন্ত্রিত আমাদের নিজেদের শরীর। এখন, এই আইএল-২ বস্তুটি কি? আইএল-২ হল এই অজস্র প্রোটিনের মধ্যে একধরণের প্রোটিন, যা কিনা তৈরী হয় টি-লিম্ফোসাইট বলে একধরণের শ্বেত রক্তকণিকা থেকে। এইরকম আরো নানান আইএল প্রোটিন আছে। সারা শরীরে নানা কাজে তারা ভীষণ ব্যস্ত। খুব সহজে বললে, এই আইএল-২ যদি শরীরে বেশি পরিমাণে ঢোকানো যায় তবে উল্টে তারা এই টি-লিম্ফোসাইটকেই বেশি করে সক্রিয় করে তোলে। তা এই টি-লিম্ফোসাইট বেশি সক্রিয় হলে কি এমন হাতি-ঘোড়া লাভটা হবে শুনি? হাতি-ঘোড়া কি বলছেন মশাই? একেবারে ঐরাবৎ বা উচ্চৈঃশ্রবা বলা যেতে পারে। টি-লিম্ফোসাইট হল আমাদের শরীরের সেই মহাঘর্য কোষ যা আমাদের শরীরের কোয়ালিটি কন্ট্রোলার। শরীরের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো রকম কোষকে খুঁজে নিয়ে তাকে বেমালুম গিলে ফেলে সে। অবশ্য চিনে নেবার জন্য আরো অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য লাগে। মানে অন্যান্য ধরণের রক্তকণিকাদের আর কি। সেসব এখন বাদ থাক বরং। গিলে ফেলার পর কি হল বলি। তারপর সেই গিলে ফেলা দুট্ট কোষকে একেবারে কীচক বধের মতন কুচি কুচি করে নষ্ট করে ফেলে, তাকে আমাদের শরীরের ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে, তবে তাদের ছুটি। হ্যাঁ রে বাবা আমাদের শরীরে প্রতিটি কোষে অসাধারণ একটি রিসাইকেল বিন সিস্টেমও আছে তো। আচ্ছা সে গল্পও নাহয় পরে হবে। আপাতত গরম্যানে ফিরতে হবে। তাহলে কি দাঁড়ালো? আইএল-২ বেশি থাকলে, টি-লিম্ফোসাইট বেশি করে এই আপদ বিদায়ের কাজটি করতে পারবে। সে বাইরে থেকে শরীরে ঢোকা বিচ্ছু জীবাণুই হোক বা গরম্যানের মতন বিগড়ে যাওয়া নিজের শরীরের কোষই হোক। এই আইএল-২ থেরাপি কাজ করেছিল গরম্যানের শরীরে। প্রায় পনের বছর গরম্যান ক্যান্সার ফ্রি জীবন কাটালেন। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করা ছাড়া আর কিই বা করার ছিল তাঁর। গরম্যানের নিজের ভাষায় বললে, “Some doctors say my immune system is really smart, I just know I’m lucky.”

এই আইএল-২ দিয়ে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে (ইমিউন সিস্টেম) ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র করার পদ্ধতিটিই ইমিউনোথেরাপি (immunotherapy) হিসেবে ১৯৯২ তে প্রথম FDA (Food and Drug Administration) র মান্যতা পায়। সকলের শরীরের ইমিউন সিস্টেম সমান ভাবে সক্রিয় নয়, সুতরাং গরম্যানের শরীরে আইএল-২ কাজ করলেও আমার আপনার শরীরেও যে ঠিক একইরকম ভাবে কাজ করবে তার তো কোনো স্থিরতা নেই না। সুতরাং আরো অন্য অন্য ইমিউন ফ্যাক্টর খুঁজে বের করতেই হবে। মেলানোমা ছাড়াও অন্যান্য ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও ইমিউনোথেরাপির হাতিয়ার অন্য কোনো প্রোটিন। সুতরাং এই ক্যান্সার-ইমিউনোথেরাপি তে রিসার্চ, ইনভেস্টমেন্ট হু হু করে বাড়তে শুরু করল। তার পরবর্তী প্রায় একদশক কেটে গেছে আরো নতুন ইমিউন প্রোটিন খুঁজে বের করার জন্য। কিন্তু গরম্যানের মতন সাফল্য কোনোটাতেই আর আসেনি। বহু কোম্পানি, বহু সায়েন্টিফিক গ্রান্ট ব্যয় করেও কেবল হতাশারই ইতিহাস।

ইমিউনোথেরাপির আসল ইতিহাসের শুরু কিন্তু এর অনেক অনেক আগে। ১৮৯১ এর আগেই ডাক্তাররা নজর করেছেন যে, কোনো ইনফেকশন হলে রহস্যজনক ভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যান্সারের প্রকোপ কমে যাচ্ছে। ১৮৯১ সালে, নিউয়র্কের সার্জেন ডঃ উইলিয়াম কোলে (William Coley) সেই অবজার্ভেশনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে প্রথম রোগীদের টিউমারে ব্যাকটেরিয়া ইনজেকশন শুরু করেন। তাঁর আশা ছিল এই যে, বাইরের ব্যাকটেরিয়ার জন্য শরীরের ইমিউন সিস্টেম সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং সেই সক্রিয় ইমিউন সিস্টেম ব্যাকটেরিয়ার সাথে সাথে একই সঙ্গে টিউমারকেও ধ্বংস করবে। এইটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ আজকের এই বিশাল ক্যান্সার ইমিউনোথেরাপির জগতের। যদিও কোলের প্রচেষ্টা ছিল একেবারেই একক। এবং সব চাইতে বড় কথা, ব্যাপারটা এতটা সোজা নয়। ইমিউন সিস্টেম সক্রিয় হল আর গপ করে ক্যান্সার কোষকে গিলে ফেলল, তা হয় নাকি? মনে করুন আপনার বাড়িতে চোর এলো। আর আপনার কুকুর তাকে চিনে ফেলে চোঁচাতে লাগলো এবং আপনি বন্দুক নিয়ে চোরকে আটকে দিলেন, আর চোর ধরা পড়ে গেল। এতই সোজা নাকি? চোর প্রথমেই এসে কুকুর আর ওই বন্দুকটার ব্যবস্থা নেবে তারপর নিজের কাজ শুরু করবে। ইমিউন সিস্টেম যেমন স্মার্ট, ক্যান্সার কোষ গুলি তার এক কাঠি বাড়া। তারা প্রথমেই নিজেদের এমনভাবে আড়াল করবে যাতে আপনার টি-লিম্ফোসাইট তাকে চিনতে না পারে। তারপর টি-লিম্ফোসাইট যাতে কাজ করতে না পারে তার জন্য কিছু প্রোটিন নিজের শরীরে তৈরী করবে ঢাল হিসেবে। মানে ওই কুকুর আর বন্দুকের কাজটাকে অকেজো করে দেওয়া আর কি। তার পর শুরু করবে নিজের বিধ্বংসী কাজ। তা এইসব বজ্জাত গুন্ডা প্রোটিন, যারা টি-লিম্ফোসাইটকে আটকে ক্যান্সারকে বাড়তে সাহায্য করে, তাদেরকে কোনোভাবে আটকে দেওয়া যায় কিনা, ধ্বংস করা যায় কিনা তার প্রচেষ্টা চলছিলই অনেকদিন ধরে। এইরকম একটি ঢালস্বরূপ প্রোটিন হলো CTLA-4. অনেক বছরের অনেক ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর শেষে ২০১১ সালে FDA এই CTLA-4 কে নষ্ট করতে পারে এমন একটি ড্রাগকে বাজারে আসার অনুমতি দিল। বাজারে এল প্রথম ইমিউনোথেরাপিউটিক ড্রাগ Yervoy (ipilimumab)।

অর্থাৎ ব্যাপারটা হল এরকম, শরীরের কোনো কোষ ক্যান্সার কোষে পরিণত হলে টি-লিম্ফোসাইট তাকে নষ্ট করতে ছুটে আসবে, ইতিমধ্যে ক্যান্সার কোষ এই CTLA-4 এবং আরো অন্য সব ঢাল বাগিয়ে বসে আছে টি-লিম্ফোসাইটকে আটকাতে বলে। ফলে টি-লিম্ফোসাইট আর নিজের কাজ করতে পারছে না। এমতাবস্থায় যদি Yervoy (ipilimumab) এর মতো কোনো ড্রাগ রোগীর শরীরে দেওয়া যায় তবে CTLA-4 কে আটকে টি-লিম্ফোসাইট আবার তার নিজের মত করে ক্যান্সার কোষ নষ্ট করতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা Yervoy এর লম্বা কার্যকারিতা। Yervoy নিয়ে তেরো বছর পর্যন্ত মেলানোমার রোগী নিরাময় নিরাময় পেয়েছেন এই উদাহরণও আছে। সমস্যা হল অন্য জায়গায়। Yervoy কাজ করল মাত্র আট শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে। কারণ সকলের ইমিউন সিস্টেম সমান নয়। এবং CTLA-4 ছাড়াও আরো ঢাল আছে ক্যান্সার কোষের নিজেকে বাঁচাতে। এমনকি পনেরো শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে সাইড এফেক্ট দেখা গেল Yervoy নেবার পর। কারণ, কিছু ক্ষেত্রে ক্যান্সার কোষের সাথে সাথে সাধারণ নয় কোষকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে এই Yervoy। এখন উপায়?

CTLA-4 এর মতোই ক্যান্সার কোষের আরো একটি ঢাল হল PDL-1। প্রথম থেকেই কিছু গবেষক CTLA-4 এর সাথে সাথে PDL-1 এর বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। Yervoy বাজারে আসার পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে এলো Nivolumab, PDL-1 এর কার্যকারিতার বিরুদ্ধে ড্রাগ। PDL-1 ইনহিবিটর, Nivolumab এর সুবিধা হলো, এটি CTLA-4 ইনহিবিটর, Yervoy চেয়ে অনেক অনেক কম ক্ষতিকর নন-ক্যান্সার সাধারণ কোষের জন্য। অর্থাৎ এটি সাধারণ কোষের মধ্যে থেকে আরো ভালোভাবে ক্যান্সার কোষ কে খুঁজে নিয়ে তার PDL-1 প্রোটিনকে নষ্ট করে। এখন, CTLA-4 ইনহিবিটর এবং PDL-1 ইনহিবিটর, দুটোর মিলিত শক্তি আরো ভালো ভাবে সমর্থ হল ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে। ইমিউনোথেরাপিতে সাড়া দিলেন আরো বেশি সংখ্যক রোগী। সাফল্যের হার আরো একটু বাড়লো। এখন ক্যান্সারে ব্যবহৃত অন্য কেমোথেরাপি এবং রেডিয়েশন থেরাপির সাথে মিলিয়ে এই দুটি ইনহিবিটরকে ব্যবহার করার চেষ্টা শুরু হল। মানে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এরকম যে, অন্য এন্টিক্যান্সার ড্রাগগুলি শরীরে ঢুকে ক্যান্সার কোষকে মারবে, রেডিয়েশন থেরাপি ক্যান্সার কোষকে মারবে ও সাথে সাথে ইমিউন ফ্যাক্টর গুলোকে টেনে ক্যান্সার এর জায়গায় নিয়ে আসবে। এবার এর সাথে CTLA-4 এবং PDL-1 ইনহিবিটর দিয়ে ক্যান্সার কোষের CTLA-4 এবং PDL-1 কে ধ্বংস করে তার চারপাশে নির্মিত সুরক্ষাবলয়টিকেও যখন ভেঙে দেওয়া হল তখন, শরীরের টি-লিম্ফোসাইটও তার সাথে হাত লাগালো ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে। এখন কিন্তু সাফল্যের হার আরো অনেক বেশি বেড়ে গেল। তবুও কিন্তু সমস্যা একটা রয়েই গেল, এই নানান কেমোথেরাপি এবং রেডিয়েশন বিভিন্ন রোগীর শরীরে বিভিন্ন রকম কাজ করে, এদের নানান সাইড এফেক্টগুলো তো রয়েই গেল। কেমোথেরাপি এবং রেডিয়েশনের অফ টার্গেট এফেক্টের জন্য তারা ক্যান্সার কোষ ছাড়া কিছুটা হলেও সাধারণ কোষকে নষ্ট করে তার ফলে টিউমার সাইজ ছোট হয়ে বা অনেক ক্ষেত্রে মিলিয়ে গেলেও অনেকের ক্ষেত্রেই তারা আবার ফিরে এলো, বা অন্য শারীরিক সমস্যা শুরু হল। যে সমস্যার সমাধান এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। পরবর্তী ধাপের চ্যালেঞ্জ এইটাই। গবেষকরা নানান দিক থেকে এই সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনো সময় আসেনি সেই গল্প লেখার। হয়ত আরো পাঁচ বা দশ বছর পর আমাদের মুখে হাসি ফুটবে। আসার কথা এই যে, চিকিৎসায় সাড়া দেওয়া রোগীর শতকরা অনুপাতটা এখন অনেক অনেক বেশি।

এর মধ্যে একটি প্রজেক্টের কথা না বললেই নয়। সেটি হলো, এডাপ্টিভ টি-সেল থেরাপি। মেরিল্যান্ডে ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক ডঃ স্টিভেন রোজেনবার্গ একটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু করলেন, যেখানে ক্যান্সার রোগীদের শরীর থেকে তাদের টি-লিম্ফোসাইট এবং খানিকটা ক্যান্সার কোষ বের করা হল। তারপর ওই টি-লিম্ফোসাইটের মধ্যে থেকে যারা ওই রোগীর ক্যান্সার কোষকে মারতে পারে তাদের বেছে নিয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল। তারপর সেই কোষগুলিকে ওই যে প্রথমে বলেছিলাম আইএল-২ (গরম্যানের চিকিৎসায়), তাই দিয়ে এক্টিভেট করে আবার রোগীর শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এবং এই যাত্রায় ডঃ রোজেনবার্গ প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মেলানোমা রোগীর টিউমার কমিয়ে দিতে, এমনকি কুড়ি শতাংশের সম্পূর্ণ নিরাময় করে দিতে সমর্থ হলেন। ১৯৯৮ এ যখন গরম্যানের চিকিৎসা শুরু হয় তখন মেলানোমা রোগীর আয়ু ছিল খুব বেশি হলে একটি বছর। যাত্রাটা বড় কম দিনের ছিল না, প্রায় দুই দশক।

এডাপ্টিভ টি-সেল থেরাপির সবচেয়ে বড় সমস্যা হল টেকনিক্যালিটি। রোগীর দেহ থেকে টি-সেল বের করে এনে-ঝেড়ে-বেছে-এক্টিভেট করে আবার রোগীর দেহে সৃষ্ট কোষগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে অনেক গুলো টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জ আছে। ফলত চিকিৎসার খরচ বাড়ে এবং সাফল্যের হার একটু হলেও কমে।

আরো একটি বিষয় হল, সমস্ত রকম ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ইমিউনোথেরাপি কাজ করবে না। কারণ খুব সোজা, আপনার টি-লিম্ফোসাইটকে তো ক্যান্সারের জায়গায় পৌঁছতে হবে, তবে তো ক্যান্সার কোষ সেই টি-লিম্ফোসাইটের বিরুদ্ধে CTLA-4, PDL-1 বা অন্য প্রোটিন দিয়ে নিজের চারপাশে সুরক্ষা বলয় তৈরী করবে, আর তখন আপনি এইসব প্রোটিন এর বিরুদ্ধে ইনহিবিটর ব্যবহার করে সেই সুরক্ষাবলয় ভেঙে টি-লিম্ফোসাইটকে জায়গা করে দেবেন ক্যান্সার কোষকে মারার। এখন টি-লিম্ফোসাইট যদি নাই পৌঁছায় তবে তো এই অস্ত্রে যুদ্ধে জেতা যাবে না মশাই। তখন অন্য উপায় ভাবতে

হবে। সে আবার অন্য গল্প। কিন্তু হ্যাঁ, দুই দশকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা গবেষণার পরে মেলানোমা, কিডনি বা ফুসফুসের ক্যান্সারের মতন ইমিউন কোষের সহজ বিচরণ ভূমি যেসব ক্যান্সার, তাতে এই ইমিউনোথেরাপি নিঃসন্দেহে দিনবদলের খবর এনেছে।

আর সেই দিনবদল হয়েছে কাদের হাত ধরে জানেন? এই দুই দশকের যাত্রাপথের প্রধান দুই কাভারী কারা বলুন দিকি? নিশ্চয়ই তাঁদের নাম আপনি জানেন। মানে খবরের কাগজে, টিভিতে দেখেছেন। আচ্ছা বলছি, জেমস এলিসন (James P Allison) আর তাসুকু হানজো (Tasuku Hanjo) এই নাম দুটো নিশ্চয়ই আপনার চেনা? তাই না? গতবছর মানে, ২০১৮ তে ফিজিওলোজি এন্ড মেডিসিনে নোবেলটা এঁাদের দুজনের নামেই লেখা হল যে। সেই কোন ১৯৯০ সাল নাগাদ CTLA-4 এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এলিসন, আর PDL-1 বিরুদ্ধে হানজো। তারপর তো ইতিহাস।

১৯৯৮ এর গরম্যানের গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম। যখন তাঁর খাতায় কলমে আয়ু ছিল মাত্র এক বছর, ২০১৪-র সেই একই গরম্যানের কথা বলি। গরম্যান ২০১৪-তে বারবার দুঃখ করেছেন যে মেলানোমা সাপোর্ট গ্রুপে পাওয়া তাঁর এক বন্ধুও যদি তাঁর সাথে ইমিউনো থেরাপির ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে নাম লেখাতেন। তাঁর অন্য আর এক বন্ধুর কাহিনী অবশ্য একদম বিপরীত। তিনি CTLA-4 ইনহিবিটর, Yervoy ট্রিটমেন্টে সম্পূর্ণ নিরাময় পেয়েছেন। গরম্যানের নিজের মেলানোমা? প্রতি দুই বছর অন্তর স্ক্যান করা হয়। এখনো কোনো সমস্যা নেই তাঁর। তাঁর নিজের ভাষায়, “My immune system has it under control.”

“KNOCK CANCER OFF THE BOARD”





## আনন্দম শাস্ত্রী

### কলকাতা একাত্তর

একাত্তরের ভারত পাক যুদ্ধের সময় শিশুমনের অবস্থিতির একটা রূপরেখা অবশ্যই জানার দরকার। তার কিছু আগেই চাঁদে মানুষ পা দিয়েছে। নীল আর্মস্ট্রং এর নাম আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন তখন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের মাথাতেও সেই সবার হাতছানি ছিল। তাছাড়া সোভিয়েত রাশিয়া থেকে অত্যন্ত সুলভে বেশ কিছু বিজ্ঞান চিন্তাধারার বই তখন এখানে রমরমা। সবই বাংলা অনুবাদ। মহাকাশ জয় নিয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার এক দ্বন্দ্ব চলছিল। ইউরি গ্যাগারিন নামে জনৈক রাশিয়ান নভোচারী কিছু বছর আগে মহাকাশ ঘুরে এসেছেন। তা সে সব বিষয় যখন ছোটদের কাছে আলোচ্য বিষয় তখন যুদ্ধ ব্যাপারটাই বা কেন হবে না!



যুদ্ধ বলতে আবার আমাদের শুভি ছন্ডির যুদ্ধটাকেও মনে হতো। ‘তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল’। গুপী গাইন বাঘা বাইন। সন্তর সালে সেই ছবিও দেখা হয়ে গেছে।

বহুমুখী চিন্তার মধ্যে তখন আমাদের নিত্য ভাবনা প্রবাহ।

সেই শৈশবে শুভ ছিল আমার বন্ধু। আমাদের বাড়ির কিছুটা দূরেই তাঁদের বাড়ি। দুজনেই সে বছর থ্রি তে উঠবো।

ওদের বাড়িতে একটা আধুনিক এবং শিল্প সাহিত্যের এক অত্যাশ্চর্য পরিমন্ডল ছিল। অজস্র বই আসতো। সে গল্প হোক আর বিজ্ঞান। সেই বইগুলোর একনিষ্ঠ পাঠক ছিল শুভ। আমাকেও পড়াতো ওর মনপসন্দ বইগুলি। বেশ কাটতো সময়।

একদিন ঐ যুদ্ধের যখন দামামা বাজছে শুভ জিজ্ঞাসা করলো – বলতো যুদ্ধে কোন জিনিসটি সবচে আগে দরকার?

বললাম – বন্দুক। হাতিয়ার। হাতাহাতি করার জন্য।

বললে – না হলো না।

বলি – তবে জীপগুলি। গাড়ি চড়েই তো যুদ্ধ করতে যায়।

বললে – আর কি মনে হয়?

বললাম – খাবার দাবার। না খেলে যুদ্ধ করবে কেমন করে? সেটাও হতে পারে।

চোখের মোটা কাঁচের চশমাটি খুলে জামার আস্তিনে মুছে বললে – কোনটাই নয়। সবচেয়ে প্রয়োজন ট্রান্সমিটার। খবরাখবর পাঠানোর মেশিন। সবচে আগে দরকার সেটাই।

চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। বলি – কিন্তু তাতে আমাদের কি?





বললে – আমরা ঐ মেশিনটি বানাবো ।

চমকে উঠি – কি দিয়ে? – সুতো, দেশলাই বাস্ক আর ফানেল দিয়ে । সে জানালে ।

‘নিজে হাতে করো’ নামে একটা বই বের করলো সে । তাতেই সেই হোমমেড ফোনের বিস্তৃত বর্ণনা ছিল । দেশলাই বাস্কের কথা বলতে হবে আর ফানেল কানে দিয়ে কথা শুনতে হবে । মধ্যে থাকবে দীর্ঘকায় সুতো । তাতেই বাজিমাতি ।

জোগাড় যন্ত্র করেই রেখেছিল সে । এবার শুধু প্রস্তুতি । দেরি করলাম না, বই পড়ে মরা । শুনছিলাম বাংলাদেশে ছোট ছোট ছেলেরা তখন মুক্তি যুদ্ধে যোগদান করছে । ভাবলাম যদি কখনো এখানেও যুদ্ধ শুরু হয় তবে এই সব শিখলে যুদ্ধের কাজে আসবে । খবরাখবর আদানপ্রদান দিব্যি করা যাবে । মুক্তি যুদ্ধে নাম দেব দুজনে ।

প্রথমে টেস্টিং করা হলো শুভ্রদের দশ বাই দশ ঘরের মধ্যে । ও যা বলে দেশলাই বাস্কের ভিতর তাই আমি শুনতে পাই ফানেল কানে । এবার ও বলে – তুই কিছু বল ।

আমি গান শোনাই – আমার সোনার বাংলা । আমি তোমায় ভালোবাসি ।

খুব খুশি হলো সে । বললে – এবার ডিসট্যান্স বাড়িয়ে দেখতে হবে কতটা কাজ করছে মেশিন ।

– কি করবি ? শুধাই তাকে ।

তোর বাড়ি থেকে আমার বাড়িতে এবার কথা হবে ।

দেরাজ খুলে একটা সুতোর রিল বের করলে সে । মোট দুটো সুতোর চ্যানেল হবে । একটাতে দেশলাই বাস্ক বাধা থাকবে অন্যটিতে ফানেল । ফানেলের সাথে বাধা সুতোর অপর প্রান্তে দেশলাই বাস্ক থাকবে । ঐ একই ভাবে দেশলাই বাস্কের অন্য প্রান্তে একটি ফানেল ।

এই সব করতে করতে বেশ বেলা গড়িয়েছে । অন্ধকার হয় প্রায় । বলি – আজ এটুকু থাক । কালকে নাই আমার বাড়িতে সুতোর কানেকশন নেব ।

ও বেশ রুগ্ন হয়ে বলল – তুই থামবি । চল আমি সুতো টেনে নিয়ে যাচ্ছি । তুই সাথে আয় ।

সুতোদুটোর এক প্রান্ত শুভ্রদের দোতলার ঘরে রাখা হলো । বাকি প্রান্ত ফানেল আর দেশলাই বাস্ক বেঁধে পাঁচিল টপকিয়ে এর ওর বাড়ির টালির ছাদ টপকিয়ে আমাদের বাড়ির পাঁচিলের কাছে এলো সে । সামনে একটা শিউলি গাছ । ওটা টপকিয়ে তবে আমাদের বাড়ির চৌহদ্দির ভিতর পড়বে সেটা । বলল – এ দুটো গাছের উপর দিয়ে ছুঁড়তে পারবি তুই ?

দে । দেখি । চেষ্টা করি ।

ছুঁড়তে গিয়ে ফানেল আটকালো গাছের মগ ডালে । শুভ্র রাগলো এবার । কোথ থেকে একটা বাঁশ জোগাড় করে শিউলি গাছ থেকে ফানেল ঝাড়তে লাগলো সে ।

অন্ধকার নামছে । ব্ল্যাক আউট শুরু হবে এখন । দেরি হলে মা বকবে । বলতেই বলল – আমাকেও মা বকবে । তাতে কি যুদ্ধ থামবে ?

ফানেলটি এবার নিচে পড়তেই সর্ব শক্তি লাগিয়ে শুভ্র নিজেই সেটা ছুঁড়লো আমাদের বাড়ির পানে । টং করে একটা শব্দ হলো । কলতলায় টিনের বালতিতে গিয়ে পড়লো সেটা । শুভ্র বলল – এবার তুই ওটা নিয়ে ঘরে ঢুকে জানলার ধারে আয় । আমি আমার বাড়ি থেকে কথা বলবো ।

ফিরলাম ঘরে। বালতির জলে ভিজে গেছে সুতো। জানলার ধারে তাই নিয়েই দাঁড়ালাম। ভিজে সুতোয় কাজ হবে কিনা কে জানে। এমন সময় দেখি ওদের বারান্দায় কানে ফানেল আর মুখে দেশলাই বাস্ম নিয়ে সে চলে এসেছে। আকারে ইঙ্গিতে জানালো সে কিছু বলবে আমি যেন ফানেল কানে শুনি। ও কিছু বলতে লাগলো কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পারলাম না। সেই কথা ইঙ্গিতে আমি বলতেই সে ইঙ্গিতে বললে এবার তবে তুই বল।

আমি গান শোনাতে লাগলাম – ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।

সে ইঙ্গিতে জানালো কিছুই শুনতে পারছে না। আমি উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে গাইতে লাগলাম এবার। ওকে গান শুনিয়েই তবে ছাড়বো। এমনই ভাবগতি আমার।

বকা দিলেন মা – হচ্ছে কি? জানলা বন্ধ কর। ঘরে এখন আলো জ্বালাবো। পুলিশ ধরবে তো আলো বাইরে গেলে।

ম্রিয়মাণ হয়ে দুম করেই শুভ্র মুখের উপর জানলা বন্ধ করতে হলো। কি ভাবলো সে কে জানে।

সারারাত উদ্ভিগ্ন হয়ে কাটলো। বাইরে আঁধার আর প্লেনের শব্দ। ভাবছি সকাল কখন হবে।

ওর বাড়ি গিয়ে জানতে হবে গন্ডগোলটা কোথায় হয়েছে?

রাত কাটতেই জলখাবার খেয়ে ওদের বাড়ি ছুটলাম। একতলায় ওদের লম্বা বারান্দায় ওর বোন দেবীকা বর্ণপরিচয় হাতে বসে পড়ছে তখন। দাদা কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই দোতলার সামনের ঘরটা দেখালো হাত তুলে। হুড়মুড় করে উঠলাম সিঁড়ি বেয়ে। টেবিলে বেশ গাঙ্গীর্ষ মুখে শুভ্র বসে তখন। আমাকে দেখে বলল – আয়।

বললাম – কাল কি হলো? কে কি বললাম কিছুই তো শোনা গেল না! কি মেশিন বানালি? ধুস।

আমাকে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো বাইরে। হাতে ফানেল আর দেশলাই বাস্মটা। নিয়ে এলো সেই শিউলি গাছের তলায়। বললাম – এখানে কেন?

সে গাছে উঠে অবলীলাক্রমে ওর ফানেলে বাঁধা সুতোর ছেঁড়া অংশটা হাতে করে টেনে নিয়ে এলো। বললে – মারাম্মক টেকনিক্যাল ফল্ট। সুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল। ইনফরমেশন পাবি কি ভাবে?

দুঃখে বেশ কিছুক্ষণ আমরা এর ওর মুখের দিকে চাইতে পারছিলাম না। খুব আহত হয়েছিলাম।

মনে হচ্ছিল যুদ্ধে ভারতীয় সেনা যেন পাকিস্তানের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে শুধুমাত্র ঐ সুতোটি ছিঁড়ে যাওয়ার জন্য।

সেই স্মৃতি ভুলবার নয়।

(আমার সেই বন্ধুটি এখন আমেরিকার সিয়াটেল-এ থাকেন। আজও সে নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। এজন্যই বুঝি বলা হয় – morning shows the day.)

**প্রণব হোড় (আনন্দম শাস্ত্রী)** – খুব শৈশব নেপাল কাঠমাণ্ডু শহরে কেটেছে। তারপর কলকাতা। এক সময় ক্যালকাটা প্যাপেটস থিয়েটারের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। বেশ কয়েকটি ডকুমেন্টারি ও বাংলা সিরিয়াল নির্মাণ করেন কলকাতা দূরদর্শনের জন্য। সাথে ছবি আঁকা ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে গল্প ছড়া প্রবন্ধ লেখালেখি। বর্তমানে আনিমেশন ছবির কাজে যুক্ত। বেশ কিছু তাঁর কমিকস ও কার্টুন পাঠকমহলেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত চিত্রনাট্য লিখে পুরস্কৃত হয়েছেন ভারত সরকারের পরিবেশ দপ্তর থেকে ১৯৯৩ সালে।

## বইমেলায় একদিন

কথায় স্নেহাশিস ভট্টাচার্য, ছবি বাতায়ন।

ময়দান ছেড়ে অনেকটাই দূরে আজ। ময়দানে বড় মায়া, ঘাসের দাগ, ধুলোমাখা শরীর, শেষ বেলায় হট কাটি। তারপর দীর্ঘ ব্যবধান, সল্ট লেকের আইল্যান্ড পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ঘেরা জায়গায়, সেন্ট্রাল পার্ক। ঘাম জানান দিচ্ছিল শীত বিদায় জানাতে চায়, আমরা ধুলো নেইয়ের মেলায়, বই এর পসরা সাজিয়ে সবাই হাজির, রসনা তৃপ্তিরও ভরপুর আয়োজন। ‘আনন্দ’, মানুষের ভিড় বাইরে বেশী, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলা, ‘আজকাল’, দৃষ্টিভঙ্গি ফ্রেমে বন্দী অনেকটা সময়। পা ফেললেই সেলফির ভিড়, আমি অপারগের দলে চেনা মুখ, শিলিগুড়ি, কলকাতা বইমেলা, ট্রেন ধরার তাড়া, প্রশান্তির পর্ব . . . ক্ষণিক দাঁড়ানো, দেজ, পেঙ্গুইন, পত্রভারতী, বাংলাদেশ, লেবু চা, হাফ প্যান্ট, কেপরি, পালাজো, জিন্স, শাড়ি, কলমকারী, কাঁধে ঝোলা, দামী ক্যামেরা, মোবাইলের ছবি, উদার গলার গান, ভালো আছি ভালো থেকো, সব ছাপিয়ে অশ্রাব্য মাইক, লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন বেশ বড় . . . আর তার বাইরের সিমেন্টের চত্বরে স্টল নম্বর শূন্য ! হ্যাঁ, স্টল না পেয়ে শূন্য থেকেই শুরু করেছেন চার কলেজছাত্র, নিজেদের লেখা, সঙ্গে নিজেদের আঁকা ছবি, ছাপাখানা থেকে বই বাঁধানো সবই নিজেদের উদ্যোগে। সাধ্যমত উৎসাহ দিয়ে আর মনে মনে কুর্নিশ জানিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম।

বইমেলার এস বি আই অডিটোরিয়ামে তখন চাঁদের হাট। শঙ্খ ঘোষ, সুবোধ সরকার, স্বাতী গাঙ্গুলী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। দর্শকাসনে আমি। হঠাৎ কানে গেল, “. . . he is the creator of Goyenda Byomkesh” . . ., বুঝতে দেরী হলো না সামনের তরুণটি শরদিন্দুবাবুর সাথে কাকে গুলিয়েছেন। মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল সত্যিটা। কিন্তু বান্ধবীর রোষানলে ভস্ম হতে হতে উনি আমার কথাগুলো ঠিক কিভাবে নিলেন বুঝতে খুব কষ্ট হচ্ছিল না।

পুত্র পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর দিকে লেজ







বাড়াতে চলেছে। প্রথমবার বইমেলা দর্শন। এই বইমেলা যে ‘আন্তর্জাতিক’ সেটা তার বাবা তাকে জানাতে ভুলে গেছে, ভারী অন্যায় হয়েছে, মেনে নিলাম। বহরটা ময়দানি তকমা ছাড়ার সাথে সাথেই যেন কম মনে হয়, যদিও ভার কমেই একটুও। একই জায়গায় অনেকটা পথ পাড়ি। মা বাবার হাত ধরে ঢুকে নতুন প্রজন্মও তার পরিধিতে। মা আর ছেলে তখন চুটিয়ে বই দেখছে আর কিনছে, প্রশ্ন ছিলই, তবু মাঝে মাঝে টাকার ছোট ব্যাগটা দেখে নিচ্ছিলাম। ধুলোহীন মেলায় বুক ভরে শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সেই বইয়ের গন্ধ ধুলো বেয়ে নাকে আসছে না। উপকরণের অভাব নেই। কফি, মোমো, জল বাদ গেল না। ওদিকে রকমারি ব্যাগের দোকান। ছোটবেলায় দেখা আইসক্রিমের গাড়ির মত ভাষানগরের বই উপচানো স্টল খুব আকর্ষণীয় এবং অভিনব মনে হল। পল্লবদা, মানসদা, শাস্ত্রী দেবী, ফোনে উপাসনা, স্কুলের ময়ূখ, স্বাগতা, মনিদীপ। দূর থেকে কবি তন্ময় চক্রবর্তী, দেজ-এর সামনেই কথা সাহিত্যিক শংকর, (জানিনা শাজাহান রিজেন্সি খুঁজছেন কি না কেউ)। মা ছেলে অনেকটা হেঁটে আনন্দ থেকে বেরিয়ে এসে দৃশ্যত ক্লান্ত। বসার জায়গাও পাওয়া গেল।

একটা চেনা গলা পেলাম। একাই ঢুকলাম অডিটোরিয়ামে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বক্তব্য রাখছেন। পত্রভারতী প্রকাশনায় বই এর উদ্বোধন হচ্ছে। চুমকি আর ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় তথা পত্রভারতী পরিবারের বড় অনুষ্ঠান পরিচালনা করার মুন্সিয়ানা দেখলে অবাক হতে হয়। মানসদা সাথী, বেশ খানিকটা সময়। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম। মেলা মেদুর জনতার ঢল। এক বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা ঘেঁষে রাতের খোঁজ নামা মেলা মোড়ানো, বই ছোঁয়া সময়। চার জন ফিরছি, গাড়ির সামনে মানসদা তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় নানা গল্প করে চলেছে, ক্লান্ত মা আর ছেলে একে অপরে গলাগলি করে ঘুম। আমি শুনছি, আর ফেলে আসা আজকের মেলা বারবার টান মেরে ময়দানে নিয়ে যাচ্ছে। স্মৃতি যেন বইয়ের পাতার মত, দমকা হাওয়ায় উলটে যায় কোনো উজ্জ্বল দিকচিহ্ন।



## Editorial

Life is what you make of it. In this spring issue of *Batayan*, we see unexpected creations. Madhurima Das finds joy in design in *Makerspace*. Shuvra Das questions the past and future in *Unfinished Stories*. Weaving a tale of mystery, M.C. Rydel shows us *The Fabric of Coincidence*.

I examine the life and work of American poet Mary Oliver who found inspiration in nature and shared clear, eloquent poems with thousands of readers worldwide. In *An American Comes Home to Eat*, Mita Choudhury gives us a view of a meal and questions of where home is.

Kathy Powers shows us the best and worst episodes of an entire life with very few words in *Some Nouns*. Susim Munshi creates a great meal and a great essay in *The Unexpected Benefits of Breakfast After Retirement*. Finally Jerry Kaiser shares his illustration of the *Postman Butterfly*.

We hope you enjoy the spring issue of *Batayan*. Please send us your stories, poems, essays, reviews and travelogues for the summer issue.

**Jill Charles**

Batayan English Editor  
jillcharles77@gmail.com  
<http://www.batayan.org>





Shuvra Das

**Unfinished Stories**

My father once broke a man's hand  
And he barely can lift his frail one now  
My mother spent hours quilting,  
Now she barely sees.

And their drawer that lays open on my lap  
with rusty bolts, old paystubs, faded postcards,  
unfinished letters, a bent screwdriver,  
with expired coupons clipped from papers  
that were destroyed eons back.

My father once broke a man's hand;  
he cannot recollect the story.  
The rusty bolt, the bent screwdriver,  
the clipped coupons, and the broken hand,  
the many beginnings, the many stories,  
the many abandoned pasts.



**Shuvra Das** is a Professor of Mechanical Engineering and lives in the greater Detroit area. He graduated from IIT Kharagpur in India and finished his PhD from Iowa State University. Photography, painting, writing, theater, and travel are some of his passions. Lately, he has been spending a lot of time in political activism.



## Madhurima Das

### Makerspace

I walk into the room and let the  
sweet smell of sawdust and possibility drift over me.  
It's thrilling and paralyzing- what do I do first  
and how do I know if it's the best thing to try or not?  
You're here with me and that worries me even more -  
now there's someone else who is going to notice  
all the mistakes I make and think less of me for it.

I grab an exacto knife to try and slice away my inhibitions,  
and when it doesn't work, I am crushed under  
the weight of my own expectations. You remind me  
that there's nothing wrong with me- it's just the blade that's dull.  
All I have to do is snap it off, come back with a fresh start,  
and try again. This time, the knife cuts cleanly through  
my worries and I peel them off the way I peel  
the dried glue on my fingers, relishing the satisfying feeling.

You take your ambitions and blow them up like a balloon,  
letting it float higher and higher until it nearly  
lifts you off the ground. I almost stop you-what if it pops,  
what if you fall, what if you float away from me -  
until I remember how glad I was that no one cautioned me  
when I flew away with the balloon like this  
that brought me to you in the first place.

When your self confidence shatters into a million pieces,  
I remind you that hot glue can fix anything.  
Use the gold sparkly glue sticks to put yourself back  
together so you don't forget that your flaws and  
your weaknesses are what make you special.



We take your frustrations to the drill press  
and make so many holes in it until it looks  
like a block of swiss cheese and you're forced to giggle.  
When you're stuck, we use pliers to pry you  
out of your mental block. I grip one end and you  
hold the other and we pull with all our might until  
something gives and you spring back into the world of creativity.

I want to bottle up the feeling of seeing something  
click in your mind for the first time and keep it  
for a rainy day so I can spray it in the air when the  
room needs a fresh perspective- essence of A-Ha, I'd call it.

We feel the pressure to be incredible and awe-inspiring  
on the first try, but we remind each other- this is just  
our first prototype of ourselves. The one where we try  
everything and see what sticks, take the things we  
love about one another and try to meld it into our own personalities.  
You give me a slice of your confidence and take  
a scoop of my sense of humor and we keep going  
and going until we become alien combinations of each others traits.

Somehow, the math flies out the window because  
suddenly the whole is greater than the sum of its  
parts and we wonder how that could have happened,  
but here in the makerspace, here, anything is possible  
because where there is learning, there is magic.



**Madhurima Das** recently graduated from MIT with a degree in Mechanical Engineering. She is now working as an educator at an innovation school where she teaches innovation, design, and engineering. She loves building and making- through her words, her art, and her engineering. She is excited to have a job where she gets to empower the next generation to be makers and problem solvers, and her poem is based on experiences with her students.



## Kathy Powers

### Some Nouns

Fetus	Virginia
Disappointment	Chicago
Pigtails	Parenthood
Shame	Violence
Intelligence	New Jersey
Divorce	College
Grandparents	Award
Molestation	Graduate
Ballet	Hospital
Camp	Chicago
Suicide	John
Medication	Activism
Graduation	Pain
College	Age
Suicide	Award
Hospital	Dust

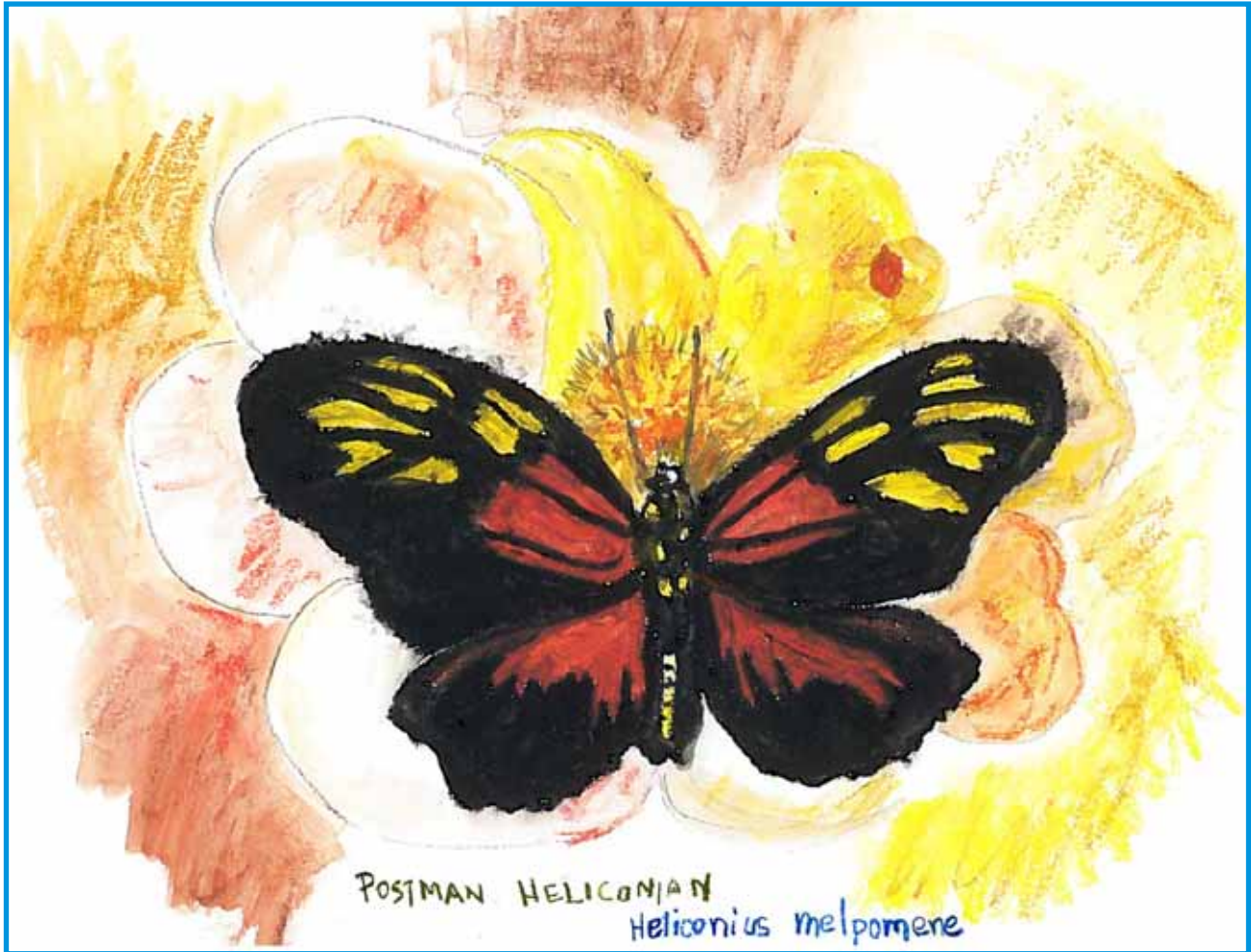
---

**Kathy Powers** — I am a civil rights activist and developed my passions from coping with bipolar disorder symptoms. I have a tagline: "Advocacy is my therapy." Through advocacy I have discovered truth and beauty in helping people and sharing art.

---

Jerry Kaiser

Postman Butterfly



**Jerry Kaiser** — Jerry is a lifelong floral artist as well as a passionate human rights volunteer. He works settling newly arrived refugees in Chicago.





M. C. Rydel

**The Fabric of Coincidence**

We are twins separated at birth,  
One in Europe, the other in America,  
We meet, sharing an Uber, to the airport.  
I get to hear my voice with an accent,  
See my hair go gray in the temples,  
Hear my ring one play on his phone,  
Learn that we live identical lives,  
Experience irony the same way,  
Say the same words at the same time.

We've exposed the fabric of coincidence.  
Space and time like warp and weft  
Guarded by three phantoms of fate.  
The first specter spins the thread of life  
From her distaff onto the spindle.  
The second measures the thread with care.  
The third cuts the thread as it unravels  
With her abhorred shears and assures us  
Of an identical demise on different continents.

Meanwhile, the fabric crackles with static electricity  
Like simultaneous signals in a circuit  
We monitor for car crashes, lotto numbers,  
Telemarketers, robocalls, and left-handed signatures.  
The fabric's all about passwords, captchas, and identical retinas  
Who don't believe in either coincidence or fate.  
Our twin faces neatly fit into the rearview mirror.  
Our twin voices trail off like canyon echoes.  
Our twin souls shine like young Cary Grants



Shirtless and lying in a chaise lounge;  
Reading brown cloth first editions of *Anna Karenina*  
Each wishing he'd been cast as Garbo's Vronsky.  
Suddenly the ride ends. One twin needs Gate A.  
The other Gate Z for the non-stop home.  
We have nothing left but an awkward hug,  
Synchronized pats on the back,  
Identical birthmarks, stutters, neuroses, and a promise  
We know neither of us will ever keep.





Jill Charles

## Mary Oliver: Wild and Precious Life

*Whoever you are, no matter how lonely,  
the world offers itself to your imagination,  
calls to you like the wild geese, harsh and exciting —  
over and over announcing your place  
in the family of things.*

From *The Wild Geese* by Mary Oliver

Years ago, I was fortunate to attend a poetry reading by Mary Oliver in Chicago. Her sense of connections between humans and nature, between words and reality, between herself and her beloved partner left a deep impression on me. Mary Oliver wrote powerful, accessible poems with poignant images and everyday words. The world lost a great American poet when Ms. Oliver died this January at age 83, but her words survive her and continue to carry the light of her mind to readers everywhere.

Born on September 10, 1935, Mary Oliver grew up in Maple Heights, Ohio spending much of her time in the surrounding woods. At age 14 she began to write poetry. Mary had the opportunity to visit the home of poet Edna St. Vincent Millay and helped her surviving sister Norma Millay organize papers that Edna had left behind.

Mary attended Ohio State University and Vassar College but did not complete her degree at either university. In 1963, her first poetry collection *No Voyage and Other Poems* was published. During the early 1980s, Oliver taught at Case Western Reserve University. In 1984 she won the Pulitzer Prize for Poetry for her fifth collection of poems, *American Primitive*. She was Poet In Residence at Bucknell University (1986) and Margaret Banister Writer in Residence at Sweet Briar College (1991). In 1992 her collection *New and Selected Poems* won the National Book Award. She moved to Bennington, Vermont, where she held the Catharine Osgood Foster Chair for Distinguished Teaching at Bennington College until 2001. Oliver also received fellowships from the Guggenheim Foundation and the National Endowment for the Arts. She published 33 poetry collections and four nonfiction books of essays on poetry and writing.

Mary Oliver's life partner of over forty years was photographer Molly Malone Cook. She described their relationship as a lifelong "conversation." Their home in Provincetown, Massachusetts inspired many of Oliver's poems. Molly was also Mary's literary agent. After Molly died in 2005, Oliver memorialized her with a book of her photos and journal excerpts entitled *Our World*. Mary later moved to Hobe Sound, Florida.

Because of her love of nature and free verse, many critics have compared Mary Oliver's poems to the writing of Walt Whitman and Henry David Thoreau. Like Emily Dickinson, her writing displays an introspective, unconventional spirituality. Her accessible language and themes have



made her one of America's most popular poets. In one National Public Radio interview Oliver said "Poetry, to be understood, must be clear. It mustn't be fancy."

I don't know exactly what a prayer is.  
I do know how to pay attention, how to fall down  
into the grass, how to kneel down in the grass,  
how to be idle and blessed, how to stroll through the fields,  
which is what I have been doing all day.  
Tell me, what else should I have done?  
Doesn't everything die at last, and too soon?  
Tell me, what is it you plan to do  
with your one wild and precious life?

From *The Summer Day* by Mary Oliver



*"Come with me into the woods. Where spring is advancing, as it does, no matter what, not being singular or particular, but one of the forever gifts, and certainly visible."*

— Mary Oliver



**Jill Charles** grew up in Spokane, Washington and majored in Creative Writing at Seattle University. In 2007 she moved to Chicago where she writes poetry and fiction and lives in the Albany Park neighborhood. Her career includes nonprofit, academic and legal office work. Jill is co-editor of *Batayan*, a bilingual literary magazine in Bengali and English. She performs her poetry at open mic nights at The Heartland Café and Royal Coffee. Jill is one of the Chicago Writing Alliance workshop facilitators at Bezazian Library in Uptown. Read her jazz age novel, *Marlene's Piano*, available from Booklocker.com.



Susim Munshi

**Essays from The Education of a Bengali Gentleman — The Unexpected Benefits of Breakfast after Retirement**

Happiness in being married and in retirement is an art. You can become quite the Zen master at both by cooking, relishing and enjoying breakfast together. The test of time in love is devotion especially to this very treasured of all meals. It's breakfast, and where and how you eat it, that is the key to a happy marriage in retirement. The finesse is not necessarily in the cuisine or its varieties. Of course choosing simple but spectacular spread of world dishes makes the meal, the setting, the conversation lively and entertaining. Love feeds on the food and strengthens the bonds. I do have a knack of selecting breads, toasts, bagels, jams, jellies, cheese, eggs, fruits, and preparing quite a surprise everyday for my wife, my lifelong companion. Once we both longed for paninis. Being retired we have to watch our budget eating out. Breakfast at home is so pleasurable that we are not willing to part with \$15-\$20 at Panera or Corner Bakery. I bought a \$5 panini press at Sur La Table super sale and pressed some wonders. My wife does not eat meat. I consume it like a tiger . . . Well, I hail from the nation and its state of the Royal Bengal Tiger. Avocadoes we both find are great in a panini. I lightly toast pumpernickel bread, butter both sides, layer pepper jack cheese, avocado goes on top, slices of home grown tomatoes, a couple of twist of the pepper mill, sprinkle salt, lay it on the oven top grill, and firmly push down on the panini press The grill leaves golden brown diagonal lines that says everything is just oozing perfection. I ball melon into small desert tumblers and slice a kiwi on top for more color. In the meantime the Darjeeling tea has steeped to the color and concentration we both prefer.

Our breakfast area is not a nook. Our living room has a very large bay window that looks out across our lawn to a park that is no less than an arboretum. There are pines, spruces, non-fruit bearing crab apples, magnolias, a tree whose leaves turn golden in the fall and never shed. A walking path winds around the park and is the perfect place for exercise. We have repurposed one of our high glass-top side tables as our breakfast table for two. There are two phoenix-rising-from-the-fire cloth draped winged chairs on either side. Breakfast gets served on gray pottery plates and the tea cups are rotated every day from a selection of blue, green, yellow, orange and brown depending on what's not in the dishwasher. There is a red tray with Japanese lettering in black on which we can stack up the jams, jellies, butter, cream for the tea, tiny salt and pepper shakers and our matching gray pottery tea kettle. Love the food and live the company. Conversation bounces like a ping pong around current events, the pesky phone call the night before, plans to visit Indía, lighthouses in Maine, my wife's next month's Facebook profile picture, to return or not return a library book. Then Linda, my neighbor who plays golf with me, walks and waves from the park. Next it will be the dog Lilly and her mistress Joanne. The crabapple tree is in full bloom. Or the once in a while cross country skier who is pushing through the new soft snow. It's winter. We are still having breakfast at our bay window, sitting in our phoenix draped chairs, munching on spicy cocktail samosas with mint and coriander chutney and steaming India spice chai. The fire is glowing. This time we can add a few sugar cubes to the tea and finish it all off with golden "motichur ladoos". Mmm - - - good!





My only quarrel with my wife is that she does not eat meats. However, we both like smoked salmon, on an open face half bagel smothered with cream cheese, topped with Tabasco. Needless to say that as bagel lovers we finally bought a bagel guillotine. For a couple of days my wife stayed away from the kitchen but adored the deftly cut bagel halves. Yes, we eat the other half spread with cream cheese topped with blueberry jam for the Mrs. and orange marmalade for the Mr. It's English Breakfast tea, no cream, no sugar cubes. The aroma escaping from the kettle spout. The big conversation - Do we have enough money put away for our younger daughter's Masters program. "It's all in the phone's notes app," I say for the third day reaching for my iPhone. I stop midway. Walk over to the island, retrieve my wife's journal and favorite pen, and go through the exercise of writing it all out in her own hand, placing a sticky page marker so she can come back to it at breakfast the next day, and the next. My dear wife returns the favor declaring we will have idli-sambar the next morning. It's love alright, for the food, the company, the joy of being put out to graze at the same time. We have earned it after thirty five years working in the Chicago Public Schools. That reminds me of the time we invited friends to brunch to celebrate our retirement. What a feast we both put out. It became the talk of the town and the envy of many still-at-work-friends. On summer omelette days, I sneak out the kitchen back door to the small but sufficient vegetable patch, grab a handful of cherry tomatoes, tear off a second handful of fresh chives and coriander, two slices of butter in our non-stick Japanese omelette pan, in go the vegetables, twist the pepper mill, sprinkle salt. The aroma begins to rise and drift while I fluff the eggs. Spoon in enough eggs to create a uniform thin layer. Wait for it to harden slightly, then roll and push back the first layer. Spoon a second thin layer and as the egg cooks, roll up the first layer into the second and repeat for the third, till you have a wonderful fluffy roll of Japanese omelette. Goes well with toast, butter, and jam. Choose green tea to stay true to the Japanese esthetics.

Love's labor is not lost. Our breakfasts help to smoothen the rough edges of our marriage. Most disagreements revolve around the idiosyncrasies of other "insensitive" family relations. Pesky and sour. If it were not for breakfast with my "buddy" we would have missed out on the excitement of sitting stone still while the hummingbird is hovering over the sweet lantanas in different shades of pink filling up the two hanging baskets we have carefully placed outside the bay window for just such small but significant visitors.

---

"Forward to the *Essays from The Education of a Bengali Gentleman*" by Susim Munshi — The great Stoic teacher Epictetus stated we become philosophers when we examine our preconceived notions, ask questions about our emotions and even the words we use each day. The essays in this collection are an honest self-examination of Bengali sentiments, values, and beliefs as perceived by the author who while growing up in a traditional Bengali household learned to look at them from a different perspective while going to a Catholic School and College in India, then moving to America for the rest of his adult life."

---



Souvik Dutta

## Purusha Suktam — Explanation of the First Six Verses

### Introduction

On Vernal Equinox every year, the planet Earth experiences a magical moment — equal day and night with the length of days eventually increasing from that point in time. Ancient seers imagined that moment in time as the Upendra (Vamana avatar of Vishnu) conquered the three worlds with his three steps. Vernal Equinox is thus called Haripada in Sanskrit. All across the globe, this marks the advent of spring and in ancient India, this was celebrated by colors to mark activity, love, and fun — all symbolic of spring.

Purusha Suktam is a hymn dedicated to Purusha. Purusha, popularly has been associated with Vishnu or Shiva. During spring, most calendars of India begin their new year. Reciting the Holy name of Vishnu during this time is considered to bring blessings for a new beginning.

### The Structure

Purusha suktam (puruṣas kṭam, पुरुष सुक्तम्) is from hymn 90 in Mandala 10 (10.90) of the Rk Veda, dedicated to the Purusha and is composed by Narayan Rsi and is addressed to Purusha Devata.

The suktam has 16 verses, 15 in the anuṣṭubh meter, and the final one in the triṣṭubh meter. The hymn finds a place in Vedic texts such as the Atharvaveda (19.6), the Samaveda (6.4), the Yajurveda (VS 31.1-6), the Taittiriya Aranyaka (3.12,13) and it is commented upon in the Shatapatha Brahmana, the Taittiriya Brahmana, the Shvetashvatara Upanishad, and the Mudgala Upanishad. It is one of the few Rk Vedic hymns current in contemporary Hinduism like the Gayatri Mantra. The Purusha sukta is also mentioned with explanations and interpretations in the Vajasaneyi Samhita (31.1-6), the Sama Veda Samhita (6.4), and the Atharva Veda Samhita (19.6). Among Puranic texts, the sukta has been elaborated in the Bhagavata Purana (2.5.35 to 2.6.1-29) and in the Mahabharata (Mokshadharma Parva 351 and 352).

### The Rsi — Narayana

The most interesting detail about this hymn from Rk Veda is the story about its author. The hymn is authored by Rsi Narayana. The Suktam comprises of 16 verses, 15 in the anuṣṭubh Chanda, and the final one in the triṣṭubh Chanda.

Rsi Narayana is one of the twins from Nara-Narayana pair incarnated over periods of time on Earth. Sri Kṛṣṇa details this to Arjuna in Bhagavad Geeta (part of Mahabharata) that Sri Kṛṣṇa was Narayana and Arjuna was Nara.

There are many tales of Rsi Narayana but the one that is most fascinating is the tale of humbling Indra. Rsis Nara and Narayana were meditating on Shiva in the holy shrine of Badrinath situated in the Himalayas. Such severe was their penance that Indra became insecure that if their tapas would reach its goal, they might ask for the throne of the heavens — Indrasana.



Indra, the King of Devas, sent Kamadeva, Vasanta Rtu (spring) and apsaras (nymphs) to inspire them with passion and disturb their tapas. When Narayana saw the attempt of Indra, he placed a flower on His thigh (uru). Immediately from there sprung from it a beautiful nymph, far more attractive than any nymph Indra sent. She was so attractive that all other apsaras immediately returned to Indra and Indra was attracted to this apsara born from the uru of Narayana. She was called Urvashi (Uru- thighs, vashi captivating).

Indra realized his mistake and sought for forgiveness from the Rsi. Rsi informed Indra that He was none other than the incarnation of Sri Hari and thus he can create beings beyond imagination for Indra and that Indrasana is not his goal since he owns the whole creation.

It is also said that Nara-Narayana worshipped Shiva at Kedarnath and pleased with their devotion Shiva resided at that place as a jyotirlinga.

Let us also at this point of time visit the name Narayana. Narayana translates to the goal of humanity, the one thing that human life seeks from its very inception. “Nara” means man, in broader sense humanity; “Ayana” meaning goal, in a broader sense purpose. This purpose can translate into many things but the true desire of the soul is to gain Moksha, liberation from the cycle of birth, death, and rebirth.

### **The Devata — Purusha**

It is impossible to talk about Purusha without talking about Samkhya philosophy and it is impossible to talk about Samkhya without talking about Rsi Kapila.

Kapila (कपिल ऋषि) was a Vedic sage credited as one of the founders of the Samkhya School of philosophy. He is prominent in the Bhagavata Purana, which features the atheistic version of his Samkhya philosophy.

Broadly, the Samkhya system classifies all objects as falling into one of the two categories: Purusha and Prakriti. While the Prakriti is a single entity, the Samkhya admits a plurality of the Puruṣas in this world.

Unintelligent, unmanifest, uncaused, ever-active, imperceptible and eternal Prakriti is alone the final source of the world of objects which is implicitly and potentially contained in its bosom. The Puruṣa is considered as the conscious principle, a passive enjoyer (bhokta) and the Prakriti is the enjoyed (bhogya).

Puruṣa is the transcendental self or pure consciousness. It is absolute, independent, free, imperceptible, and unknowable through other agencies, above any experience by mind or senses and beyond any words or explanations. It remains pure, “nonattributive consciousness”. Puruṣa is neither produced nor does it produce. It is held that unlike Advaita Vedanta and like Purva-Mimamsa, Samkhya believes in the plurality of the Puruṣas.

Prakriti is the first cause of the manifest material universe of everything except the Puruṣa. Prakriti accounts for whatever is physical, both mind and matter-cum-energy or force. Since it is the first principle (tattva) of the universe, it is called the Pradhāna, but, as it is the unconscious and unintelligent principle, it is also called the Jada. It is composed of three essential characteristics (trigunas).



We find the earliest reference of Purusha and Prakriti in the form of Ardhanareeshwara (Half Man, Half Woman) where Shiva and Shakti appeared before Brahma to advise Him on creation. Shiva is generally called Purusha and Shakti is called Prakriti. However, the concept of Purusha is deeper than the mere form of Shiva.

Indra is Purusha, Indrani is Prakriti. Brahma is Purusha, Brahmani is Prakriti. Vishnu is Purusha, Vaishnavi is Prakriti. Kumara is Purusha and Kaumari is Prakriti. Narayana is Purusha, Narayani is Prakriti. Shiva is Purusha, Shivaa is Prakriti.

The object is Purusha, Attributes of that Object is Prakriti. All possibilities are Purusha, one out of those possibilities which manifest is Prakriti.

Purusha Suktam honors the Purusha in creation. If Prakriti is the Jada, then Purusha is the Jeeva. The ultimate motive of all Jeevatma is to gain Moksha. This concept of Moksha sets the tone for Purusha Suktam. If we truly understand the essence of Purusha Suktam then forms are meaningless as are names and identities. Moksha cannot be achieved if individual existence takes precedence, Moksha can only be achieved if one is ready to immerse oneself into the ultimate source which source has many names and yet it is nameless.

#### Verse 1

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॥ १ ॥

**sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt ।  
sa bhūmim viśvato vṛtvāty atiṣṭhad daśāṅgulam ॥**

Thousand-headed is the Purusha, thousand-eyed and thousand-legged. Enveloping the earth from all sides, He transcends it by ten fingers' length.

The most common reference for this verse that comes to my mind is Chapter 11, Verse 16 of Bhagavad Gita. In this verse, after having observed the brilliance of the Vishwaroopam of Sri Krishna as Purusha, Arjuna says —

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं  
पश्यामि त्वा सर्वतो ऽनन्तरूपम् ।  
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं  
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ ११-१६ ॥

**anekabāhūdara vaktranetram; paśyāmi tvā sarvato 'nantarūpam ।  
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādim; paśyāmi viśveśvara viśvarūpa ॥11-16॥**

I behold you infinite in the form on all sides with manifold arms, stomachs, faces, and eyes; neither your end nor your middle nor also your beginning do I see, O Lord of the Universe, O Cosmic Form.

The Vishwaroopam Darshan is the turning point in the Mahabharata war. Before this stage, Arjuna keenly listened to Sri Krsna but had doubts in his mind. It was only after viewing the Purusha in Vasudeva that Arjuna truly understood the true nature of the Universe and that his being is nothing but a part of Purusha that manifested in the Universe and that which he bore a witness to in the Vishwaroopam of Sri Krsna. Truly, this verse of Bhagavad Gita echoes the verse of Rk Veda in its entirety.



In the first verse of Purusha Suktam, the transcendent totality of all creation is conceived as the Cosmic Person, the Universal Consciousness animating all manifestation.

Swami Krishnananda explains "The word 'bhumi' (meaning Earth) is to be understood in the sense of all creation. 'Dasangulam' is interpreted as ten fingers' length, in which case it is said to refer to the distance of the heart from the navel, the former having been accepted as the seat of the Atma and the latter symbolic of the root of manifestation. The word 'ten' is also said to mean 'infinity', as numbers are only up to nine and what is above is regarded as numberless."

The second line deserves a better translation. In the creation myth, which mimics the birthing process of life forms on Earth, Brahma is born from the navel of Purusha (here Narayana or Vishnu).

In the science of Vastu, this place is called **Brahmanatmasambhava**. This is detailed in Mahanirvanatantra, Chapter 13, verse 54 and Tantra-Samuccaya, Chapter 1, Verse 1.62.

The **Brahmasthan** (again a concept) is Vastu Shastra lies between the heart and the belly of Vastupurusha. This space is also called dasangula. Sankaracharya's commentary on Svetasvatropanisad, Chapter 3 details this.

Thus **dasangula** is the distance between the seat of aham; ego (navel) to the seat of atma (heart).

In the human body, the distance between the Manipura Chakra and the Anahata Chakra is called Mahashunya or the simple terms the great gap. This is also called **Dasangula**.

In a pregnant lady, although the child is in the womb, the heart of the mother is what keeps the mother and child alive.

The universe (Bhumi) is the creation and Purusha is the Atma (heart) of the creation and is the overlooking it from a distance of ten fingers of Purusha. This is the true meaning of this verse.

## Verse 2

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नैनातिरोहति ॥ २ ॥

puruṣa evedaṃ sarvaṃ yad bhūtaṃ yac ca bhavyam ।

utāmṛtatvasyeshāno yad annenātirohati ॥

All this (manifestation) is the Purusha alone - whatever was and whatever will be. He is the Lord of Immortality, for He transcends all in His Form as food (the universe).

This verse has two very deep concepts - one related to Time and the other related to Sustenance. Purusha is imagined here as the Kalapurusha - the personification of Time.

In the Galactic sense, Purusha can also be imagined as the Nakshatra Purusha - the personification of the fixed stars in the sky which are Eternal.

To be very honest, even if the stars undergo supernova or destruction, Time still continues so Purusha is above Kala or Nakshatra Purusha but for all practical purposes, we as Earthlings can imagine Purusha as the Zodiac personified or the Star System personified.





The measurement of Time is done by using a system called the Calendar System. How is that developed? It is developed by the Sun (solar) and the Moon (lunar) and in most ancient civilizations it was Soli-Lunar.

The dance of the Sun and the Moon creates the zodiac as the Moon appears full twelve times in a complete revolution of the Earth around the Sun. This gives birth to 12 months and 12 zodiac signs, one for each month. This gives rise to Sankratis and the entry of the Sun in each of these zodiac signs. These concepts, to us Earthlings, are eternal and can be equated to our understanding of Purusha. However, even if these celestial bodies don't exist, Time will and thus Purusha is greater than Nakshatra or Kala Purusha.

What is the food (Sustenance) for the Universe?

Science has given us three possible fate of the Universe - Big Crunch, Big Rip, and Indefinite Expansion. Rk Veda has already provided the answer to this 10-12 thousands years ago - Indefinite Expansion.

To sustain something, one must grow. The growth of the Universe or expansion of the Purusha is based on a concept of food of the Universe.

To best understand the accelerating Universe, Rsi equated it to the simple concept of a human child growing due to sustenance it receives. In this case, the food is the dark energy (Vishnu/Krsna Shakti). Purusha transcends all His form as food (anna) literally means the Universe expands at an accelerated rate and expands due to Dark Energy. The Purusha Suktam from this point on takes a completely scientific turn in its esoteric explanation.

Gravity (Akarshan Shakti) pulls things towards each other. Every celestial body has gravity then over time why is the Universe not collapsing on itself? Instead, it is accelerating (also can be viewed as growth) at a rate much faster than expected.

The answer is Dark Energy. In physical cosmology and astronomy, dark energy is a hypothetical form of energy that permeates all of space and tends to accelerate the expansion of the universe. Dark energy is the most accepted hypothesis to explain observations since the 1990s that indicate that the universe is expanding at an accelerating rate. This very Dark Energy is called Narayani or Aadi Shakti.

### Verse 3

एतावानस्य महिमातो ज्यायैश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥

etāvān asya mahimāto jyāyāś ca pūruṣaḥ ।

pādo 'sya viśvā bhūtāni tripād asyāmṛtaṁ divi ॥

Such is His Glory, but greater still is the Purusha. One-fourth of Him all beings are, (while) three-fourths of Him rises above as the Immortal Being.

The Purusha is superior to his expansive power. This clarifies that the concept of the expansion (Dark Energy) is an attribute of the Purusha but Purusha is much more superior to this one attribute ascribed to Him.



A Yogi who has all the eight siddhis is greater than the siddhis he accomplished. The Eight siddhis are stated as -

- Anīmā: reducing one's body even to the size of an atom
- Mahima: expanding one's body to an infinitely large size
- Garima: becoming infinitely heavy
- Laghima: becoming almost weightless
- Prāpti: having unrestricted access to all places
- Prākāmya: realizing whatever one desires
- Iṣṭva: possessing absolute lordship
- Vāstva: the power to subjugate all

Hanuman was blessed with all the 8 siddhis and yet 8 siddhis He had doesn't define Him. He is superior to the siddhis He has. In fact what defines Him is His devotion, His Bhakti.

The glory of Purusha doesn't define Purusha but is one of his attributes.

According to the Planck mission team, and based on the standard model of cosmology, the total mass-energy of the universe contains 4.9% ordinary matter, 26.8% dark matter and 68.3% dark energy.

Rk Veda and Purusha Suktam have a simpler and approximately a close percentage. 25 % of Purusha is the manifested Universe, 75 % is the Un-manifested Universe.

The Universe has a fractal nature. 25% of Earth is Land, 75% is Water following a fractal pattern of Energy and Matter.

#### Verse 4

त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः। ततो विष्णुः व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ ४ ॥

**tripād ūrdhva ud ait puruṣaḥ pādo 'syehābhavat punaḥ |**

**tripād ūrdhva ud ait puruṣaḥ pādo 'syehābhavat punaḥ |**

Three-quarters of Him remain above (unmanifest). One-quarter of Him has manifested here. With that, He pervades all the living and the non-living.

Every Vedic text can be interpreted in three ways — Adi bhautik, Adi daivik and Adhyatmik — Material, Divine and Spiritual signifying a meaning that best caters to body, mind, and soul.

The materialistic meaning has already been explained earlier, Dark Energy prevails 75% of the Universe and Matter (Dark and otherwise) prevails 25 % of the Universe. It is through Matter that both living and non-living beings — Jada and Jeeva functions since these have material bodies.

The Adi daivik interpretation is the mythological tale of Vishnu, the youngest brother of Indra. His other name is Upendra (young Indra). The most popular name given to Him is Vamana Avataar. The world viewed Vamana as a small man or dwarf. However, this symbolizes the first step which is manifested world and a world in which we live but often don't recognize the Purusha in life



around. The three steps of Vishnu (tripada) were beyond imagination and perception of the human mind. It symbolizes the un-manifested or “not understood” part of the mind and the perceived creation.

The spiritual meaning is that soul is trapped in the body which is a product of our past karmas. However, the soul has the potential to tap into the unmanifested divine by a process of purification.

The Paramatma is all around the soul and both the Atma and Paramatma are identical with just one difference. Atma has manifested and thus bound by the Laws of Karma, Paramatma is un-manifested and thus beyond the Laws of Karma. The journey to reach from the manifested Purusha (us) to the unmanifested Purusha (God) should be the motive of life and once the destination is reached, the soul experiences Moksha or param padam of Sri Hari Haripada.

#### Verse 5

तस्माद्विराळजायत विराजो अधि पूरुषः । स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिस्थो पुरः ॥ ५ ॥

**tasmād virāḍ ajāyata virājo adhi pūruṣaḥ ।**

**sa jāto aty aricyata paścād bhūmim atho puraḥ ॥**

Variety came forth from Him and thus from within he became virAt puruSHa. He grew immensely and became the cosmos (Brahmanda).

Adi bhautik — The explanation is the process of creation from Big Bang Theory. Everything sprung from within the Big Bang. The Universe started to grow and expand. The same fractal nature of the Universe can be extended to the process of conception and development of the fetus and birth of a child.

Adi Daivik — Vamana (Vishnu) appeared as a small dwarf and from within expanded into Virat Purusha. He grew to cover the Brahmanda (Brahm-Cosmos, anda egg-shaped or linga shaped).

Adhyatmik — This explains the expansion of the mind and thought. A simple piece of paper and a verse written on it when meditated on can awaken the mind; the mind can then direct the Atma to the Paramatma. The Manas has the potential of self-evolution and to become as expansive as the universe itself.

#### Verse 6

यत्पुरुषेण हविषा देवा यजमतन्वत । वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥

**yat puruṣeṇa haviṣā devā yajñam atanvata ।**

**vasanto asyāsīd ājyaṁ grīṣma idhmaḥ śarad dhaviḥ ॥**

When (there being no external material other than the Purusha) the Devas performed a universal sacrifice (in contemplation by the mind), with the Purusha Himself as the sacred offering, the spring season was the clarified butter, summer the fuel, autumn the oblation.



The Adi bhautik interpretation of this is related to the sacrifice of the Devas (Stars, Suras). Creation couldn't have begun unless Stars were born. The birth of the Stars is the birth of Devas. That created solar systems and galaxies. In this process, one thing to be remembered was that there was nothing there but the Universe to use so it was Purusha who was sacrificed and it was Purusha as the Devas who sacrificed. This finally led to Maha Yajna - the continued process. The seasons (Rtu) were used as mediums of the sacrifice — the ghee poured in the Yajna, the food that burns and the offering that is made. Spring here refers to the good, smoothing things created in creation like the Water, summer refers to the heat from the Supernova of the Stars and autumn refers to the dying stars or stars which have sacrificed themselves for the process of creation.



**Souvik Dutta** works as an IT professional in Chicago, IL and lives with his wife Amrita and son Hridaan. His passion includes study of ancient scriptures, texts and obscure works of Vedic sages. He lectures in and around the country on Vedic philosophies.



Jill Charles

## Arrival — Movie Review

Amy Adams stars in “Arrival” as Dr. Louise Banks, a linguist professor summoned by the US Army to communicate with alien visitors from outer space.

The arrival in the title is twelve enormous black egg-shaped spaceships that land simultaneously in twelve different countries on Earth including China, Kenya, Brazil, Russia, Australia and in the Montana wilderness in the United States. In each country, human experts attempt to ask the aliens “What is your purpose on Earth?”

While curious about the aliens' origins, the humans also fear their superior technology and worry about contamination with unknown diseases. The US Army mobilizes near the spaceship, to study the aliens, but also poised for a possible attack. Forest Whitaker is excellent as Colonel Weber, the Army officer who introduces Louise to the aliens. He mediates between scientists who want to understand the extraterrestrials and some political and military leaders who view them as a threat. Questions about the aliens in the twelve locales bring up mistrust and rivalries between nations on Earth, especially the US and China.

Under pressure to learn the alien language and teach them English, Louise finds an ally in another gifted scientist, Dr. Ian Donnelly, played by Jeremy Renner. Louise faces personal losses as well as the toughest linguistic challenge ever, and risks her own safety. As they begin to decode the aliens' written language, she and Ian grow closer. Translation can be dangerous, however, when the alien words for “tool” and “weapon” are almost identical.

International audiences will appreciate “Arrival” for asking the big questions about what language is and how intelligent beings from all cultures can learn from and empathize with each other. Amy Adams is brilliant in her best role since “Doubt” and the philosophical questions of how and why we communicate with each other will stay with audiences long after the film ends.

“Arrival” was directed by Denis Villeneuve, the French Canadian director of 2013's “Prisoners” and based on “Story of Your Life” is a science fiction short story by Ted Chiang. The short story was the winner of the 2000 Nebula Award for Best Novella.



**Jill Charles** grew up in Spokane, Washington and majored in Creative Writing at Seattle University. In 2007 she moved to Chicago where she writes poetry and fiction and lives in the Albany Park neighborhood. Her career includes nonprofit, academic and legal office work. Jill is co-editor of Batayan, a bilingual literary magazine in Bengali and English. She performs her poetry at open mic nights at The Heartland Café and Royal Coffee. Jill is one of the Chicago Writing Alliance workshop facilitators at Bezazian Library in Uptown. Read her jazz age novel, *Marlene's Piano*, available from Booklocker.com.





**“Where flowers bloom so does hope.”**

– Lady Bird Johnson





“বরফঘেরা উপত্যকার এক চিলতে ঘাসে  
হালকা রোদে গুনছে কি দিন বসন্তেরই আশে ?”